নাগর নর্তকীর মেলায়

শক্তিপদ রাজগুরু

প্রাপ্তিস্থান : মৌসুমী-প্রকাশনী । কলকাতা-৬

প্রকাশকাল :
অক্ষয় তৃতীয়া
বৈশাখ, ১৩৬৮
মে, ১৯৬১

প্রকাশক :
দেবদাস বিশ্বাস
১এ কলেজ রো,
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীমৃণাল কান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৯

এই এলাকার তাবৎ মানুষদের জানানোর জন্যই ভোর থেকেই নাকাড়া বাজতে থাকে, তখনও শীত জাঁকিয়ে বসে আছে। গ্রামের গাছ-গাছালি সদ্য অঙ্কুরিত যব গম ছোলা ক্ষেতের উপর কুয়াশার চাদর জড়ানো।

বাবুপাড়ার তিনমহলা পুরোনো জমিদার-বাড়ির দেওয়ালে এসে লাগে ওই শব্দটা ডুগ-ডুগ-ডুগ ডুক্কা।

মতিবাবুর কান সজাগ।

তিনিই এখন সেজ তরফের একচ্ছত্রাধিপতি, জমিদারী চলে গেছে কিন্তু মতিবাবু তার আগেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন।

গঞ্জের হাটতলা বিরাট বাজার-এলাকা সবই তাঁর। অন্য শরিকান ছোটবাবুকে ফাঁকি দিয়ে ওই সবকিছুর দখল নিয়ে এখন ধানকল, তেলকল করেছেন। ওদিকে আছে ইঁট-খোলার ব্যবসা, কয়েকটা ট্রাক-বাসও করেছেন মতিবাবু। বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন।

মোটকথা জমিদারীর শাঁসটুকু নিয়ে এখন খোলসটাকে ছুঁড়ে ফেলে তিনি জমিয়ে আছেন ওই মেলার বারো আনার হিস্যাদার তিনি।

তাঁদের পূর্বপুরুষের আমল থেকে শীতের শেষ দিকে ওই বাগানে তাঁদের দেবোত্তর এস্টেটের কুলদেবতা গুপীনাথজীর নবরাস উৎসব হয়, সেই উপলক্ষ্যে তখন মেলা-টেলা কিছু বসতো।

এখন মতিবাবুই চেষ্টা করে সদরের কর্তাদের কাছে যোগাযোগ করে সেই মেলাকে এগজিবিশন, গ্রামীণ শিল্প-প্রদর্শনী—লোক-সংস্কৃতির প্রচার ইত্যাদির নাম করে এখন আরও জমিয়ে তুলেছেন। এখন বেশ জাঁকিয়ে বসে ক'দিন ধরে মেলাটা।

তারই প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে ভোরে নাকাড়া বাজে।

মতিবাবু শুয়ে শুয়ে শোনেন শব্দটা।

—বিশে। এ্যাই বিশে—

বিশ্বনাথ মতিবাবুর খাস বেয়ারা। কত্তাবাবুর সঙ্গে আছে অনেকদিন থেকে। কত্তাবাবুর কোন কোনদিন শুতে রাত্রিও হয়, আর মদ্যপানও চলে রাত-অবধি।

তারপর খোকন মিত্তির বাবুকে ধরে অন্দরমহলের দরজায় বিশের জিম্মা করে দেয়। বিশে তখন বাবুকে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

গিন্নীমা একবার দেখে নিয়ে ওঘরে চলে যান। মদের গন্ধ তাঁর সহ্য হয় না।

কিন্তু ভোরেই ঘুম ভাঙে মতিবাবুর। বিশের কাজও সুরু হয়, বাবুকে বিছানাতেই দলাই-মালাই করে চাঙ্গা করে তুলতে হয় তাকে।

যথারীতি বিশে আজও বাবুর ডাকে এগিয়ে এসে দলাই-মালাই করছে মতিবাবুকে।

মতিবাবু বলেন—এবার মেলা কেমন জমবে রে বিশে?

বিশে বলে—তা জমবে ভালই। এত নামডাকের মেলা। এর মধ্যেই তো দোকান-পশার আসতে লেগেছে। তা সার্কাস—টকি বাজি গায়েন ইসব বসবে তো?

মতিবাবু বলেন।

—বিরাট সার্কাস আসবে এবার। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস, আর নাচ-গানও থাকবে। আঃ ব্যাটা নাচের কথায় ঢিল দিলি যে, জোরে দাবা পা-টা।

মেলা কমিটি একটা করা হয় মতিবাবুর কথায়, কারণ সরকার নাক গলিয়েছে তাই গ্রামের কিছু লোকও কমিটিতে থাকে।

বাদল ডাক্তার এখানের অতীতের লোক—তখন পাশ করা ডাক্তা-য়ের পাশে হেতুড়ে বাদল ডাক্তারও পল্লী-অঞ্চলে জোর প্র্যাকটিশ চালাত।

এখন হাসপাতাল হয়েছে, সেই প্র্যাকটিশও তেমন নেই তার। ফলে বাদল ডাক্তারের ডাক্তারখানার ঘরটি রয়ে গেছে গঞ্জে, সেখানে অন্য কিছু হয়।

গ্রামসভার ইলেকশনে বার দু'য়েক হেরে গিয়ে বাদল এখন জনসেবা করছে। আর তার পিছনে এসে জুটেছে রবি সরাওগী।

রবি সরাওগী ও আরও দু'-এক জন মারোয়াড়ী এই গঞ্জে এসে বাসা গেড়েছে। কাপড়ের দোকান—ডাল সরষের গুদাম—সিমেন্টের এজেন্সী নিয়ে রবি সরাওগী এর মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছে।

দত্তদের পুরনো বাড়ি কিনে সেটাকে মেরামত করে তিনমহলা প্রাসাদ বানিয়েছে। বেশ হাল ফ্যাশানের বাড়ি করেছে সে।

মতিবাবুও দেখেছেন বাড়িটা।

রবি সরাওগী হাত-জোড় করে বিনীত ভঙ্গীতে বলে—গরীবখানা বানালো হুজুর! আপনার পায়ের ধুলো পড়লো—ব্যস জিয়া ভর গিয়া।

মতিবাবু ওকে দেখছেন।

বাদল ডাক্তার বলে—রবিজী খুব ভালো লোক স্যার। এর মধ্যে রামমন্দির করতে দু'হাজার টাকাও দিয়েছেন। ইস্কুলেও মোটা টাকা দেবেন সাহায্য—ওকে কমিটিতে রাখলে কাজ হবে স্যার। মেলা কমিটি বেশ জাঁকিয়ে তুলবো।

মতিবাবু প্রকাশ্যে ওকে চটাতে চান না।

রবি সরাওগী বলে—আমি কি করবে হুজুর কমিটিতে?

গোপেন দাস বলে ওঠে—সে তোমাকে ভাবতে হবে না সরাওগীজী, সেনবাবু রয়েছেন উনিই সব করবেন। আপনি শুধু কমিটিতে রইলেন।

রবি সরাওগী যেন ওদের চাপেই নতি স্বীকার করে বলে—ঠিক বাত। বলছেন যখন হুজুর—থাক্‌লো হামি।

খোকনই সেক্রেটারী।

পাকানো চিমড়ে চেহারা—রংটা ফর্সা ছিল এককালে। এখন তামাটে হয়ে গেছে। চোখের কোলে জমাট কালি পড়েছে।

মতিবাবু বলেন—হ্যাঁরে খোকা—এত মাল-মাংস খাস এখানে, ওসব যায় কোথা রে? দিন দিন যে আংরা হয়ে উঠছিস বাবা।

হাসে খোকন মিত্তির।

—পেটে যে স্বয়ং ব্রহ্মা, অগ্নিদেব আছেন গো, যা খান তৎক্ষণাৎ ভস্ম করে দেন তিনি।

মতিবাবু বলেন—তা বুঝেছি, তাই তোর শরীরে কোন পাপ নেই।

খোকন বলে—কি যে বলেন! যাই মেলার দিকে। রাজ্যের কাজ বাকী।

মতিবাবু বলেন।

—মেলার মূল মণ্ডপ, প্যানডেল যেন ঠিকমত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে আসবেন। আর কলা-মূলা-লাউ-আখ যা হয় যেন সব ঠিক ঠিক সাজিয়ে রাখে। চাষাদের বলবি দাম পরে দেব। যেন বড়সড় হয় ওই লাউ কুমড়োগুলো। আখও লম্বা দেখে দিতে বলবি।

খোকন মিত্তির করিতকর্মা লোক। সে কৃষি প্রদর্শনীর সব মালপত্র যোগাড় করে আনে। সামনে তার অনেক কাজ। আর এতে খুশীই হয় সে। খোকন বলে—ওসব নিয়ে ভাববেন না।

খোকন মিত্তিরের এই মওকায় কিছু দমকা রোজগার হয়ে যায়।

মেলা তখনও জমেনি। তালপাতা-বাঁশ-চাটাই দিয়ে সারবন্দী ঘর তৈরী হচ্ছে মেলার ওদিকের আমবাগানের ছায়ায়। ওখানে ঝুমুর দলের আস্তানা হবে। লোকজন কাজ করছে।

খোকন মিত্তির তাগাদা দেয়।

—হাত চালিয়ে কর বাবা।

এসব থেকেও তার আমদানী থাকে, আর ওপাশে দীঘির অন্যদিকে গড়ে উঠছে বড় প্যাণ্ডেল। ওখানে যাত্রা-কবিগান হবে। ডি-এম সাহেব ওখানেই স্থানীয় কৃষকদের উদ্দেশ্যে জমিতে সোনা ফলাবার জন্য ভাষণ দেবেন। কর্তারা এসে মিটিং করবেন।

ওপাশে টিনের চালা লম্বা একটানা—ওখানে তক্তা দিয়ে টানা টেবিল করে লাল শালুতে ঢেকে দিয়ে ওখানে কৃষি-দ্রব্যের প্রদর্শনী হবে। এর মধ্যে বিরাট লাউ, আটাত্তরটা ডাবওয়ালা একটা নারকেল কাঁদি, এগারো ফিট লম্বা আখ, তের হাত বিচি বিশিষ্ট বারো হাত কাঁকুড়ও এসে গেছে। নোড়ার সাইজের আলু, ঝিঙের সাইজের পটল—আর ভীমের গদার সাইজ মুলো-টুলোও আনা হবে। খোকন মিস্ত্রিকে ফর্দ দিতে দেখে মতিবাবু শুধোন—সেসব পাবি কোথায়?

খোকন বলে—তকিপুরের মেলার একজিবিশনে রয়েছে, সেখানের মেলা ভাঙলেই নিয়ে এসে নাম লেবেল পালটে এখানের কারো নাম বসিয়ে দেব। ব্যস!

হাসেন মতিবাবু—

—সেকি রে! এক মুরগী দু'-দরগায় জবাই দিবি?

খোকন মিস্ত্রি বলে—ওসব চলে সেজবাবু। দেখবেন কেমন জমিয়ে দেব একজিবিশন! কই? আপনার কমিটির বাবুরা কই? ত্যানারা দেখবেন না এসব?

খোকন মিস্ত্রির নিজের ওজন বাড়াতে জানে।

অবিশ্যি তার জন্য সে রোজগারও করে কিছু এই কাজে।

ভ্রাম্যমাণ দোকানদাররা এসে জুটছে।

রাঢ়-বঙ্গে শীতের শেষে মেলাগুলো বসে। ধান আখ উঠে যায়, শুরু হয় গম-ছোলা-মুসুর-সরষের চাষ। এসময় খাটুনিও কম থাকে জমিতে, আর হাতে পয়সা থাকে ধানও থাকে কিছু, কথায় বলে—

শিমুলের ফুল ফুটলো।

চাষার ভাত উঠলো।

অর্থাৎ মাস দুয়েক সচ্ছল অবস্থা থাকে। শিমুল ফুল ফোটে ফাগুনের শেষে, চৈত্রের প্রথমে। পৌষ থেকে চৈত্র অবধি ঘরে কিছু থাকে, তারপর আবার 'আনো আর খাও' রব ওঠে চাষী, খেতমজুরদের ঘরে।

সেই অবকাশেই মেলাগুলো ধারাবাহিক ভাবে চলে যায়।

তকিপুর দের্গায়ের মেলা ভেঙে দোকানদাররা সেখানে বেচা-কেনা সেরে আবার আসছে এখানের মেলায়। এ মেলায় কয়েকদিন বেচা-কেনা সেরে আবার চলে যাবে দোকান তুলে নিয়ে অন্য মেলার রং-বাহারের আসরে। জীবনের হাটে হাটে ওরা ফেরি করে চলে পশরা নিয়ে। আসে আবার যায়।

এখানের মেলা নিয়ে এরা এখন ব্যস্ত।

মেলার একদিকে এর মধ্যে খোকন মিত্তির অফিস সাজিয়ে বসেছে।

বাদল ডাক্তারও ঠং ঠং-এ সাইকেলটায় সওয়ার হয়ে এসে জমে এখানে।

—কি হে মিত্তির। সেজকত্তা আসেননি?

খোকন বলে—এসেছেন ওদিকে গেছেন তদারক করতে।

গলা নামিয়ে বলে বাদল ডাক্তার।

—ঈশ্বর এবার দুটো ছক বসাবে, ফি ছক ডেলি পাঁচ টাকা, ওকে একটু ভালো জায়গায় দিও হে। মানে ওই ঝুমরিওয়ালিদের আসরের কাছেপিঠে! অবশ্য তোমাকেও খুশি করবে ঈশ্বর। কই রে ঈশ্বর!

ঈশ্বরকে চেনে খোকন মিত্তির। এ অঞ্চলের ডাকসাইটে জুয়াড়ী ওই লোকটি। ওর হাতে জাদু আছে।

ঈশ্বর এসে প্রণাম করে খোকন মিত্তিরের হাতে দু'খানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলে।

—একটু কিরপা করবেন বাবু না হলে এত টাকা দিয়ে ছক পেতে মারা পড়বো।

খোকন মিত্তির নোটদুটো তৎক্ষণাৎ পকেটে পুরে বোদা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে—তা তো বুঝলাম, আর মেলা চলাকালীন ফি-রাতে তো কিছু দিতে হবে বাবা।

বাদল ডাক্তারের ভাগ আছে, ইদানীং বাদল ডাক্তার ঈশ্বরকে

মূলধন যোগায় জুয়া খেলার, আর রাতের অন্ধকারে তার রোজকারের সিংহভাগ যায় বাদলের হাতে।

বাদল বলে ওঠে—যা হয় দেবে বৈকি! কি রে ঈশ্বর?

ঈশ্বরও মাথা নাড়ে—দেখি, যদি পাই দোব না কেনে?

ওদিকে অন্য দোকানদাররাও ভিড় করেছে জায়গার জন্য।

খোকন মিত্তির বলে।

—হবে। সবার ব্যবস্থা হবে। এক এক পটি এক একদিকে করছি এবার। এই যে মনোহারী পটি, বাসন-পটি, মাদুর-পটি, রেস্তোরাঁ-পটি—যে যেমন আসছো বসে যাও দেবতার প্রণামী দিয়ে। সব পয়সাই দেবোত্তর এস্টেটের বাবা। দেবসেবায় লাগবে।

ওদিক কয়েকটা ট্রাক ধুলো উড়িয়ে এসে হাজির হয়েছে। খুঁটি, পাল, তেরপল, তারের বেড়া, তাঁবুর রাশি রয়েছে। অন্য ট্রাকে জানোয়ারের খাঁচাগুলো, কিছু লোকজনও নামছে গাড়ি থেকে ধূলি-ধূসর হয়ে।

এর মধ্যে ভিড় করেছে আধ-নেংটো ছেলের দল। কলরব ওঠে।

—বাজি এসে গেছে। ওগো মামু বাজি এয়েছে গো। কি বাঘ গো!

ওদের মাল-পত্র নামছে ফাঁকা জায়গায়।

মোটা কালো একটা প্যাণ্টপরা লোক মাথায় লম্বা টুপি নিয়ে চীৎকার করছে—ইউ ম্যান। সামালকে—

মতিবাবুও এসে পড়েন, খোকনও বের হয়ে এসেছে ওদের দেখে। দু'জনে এগিয়ে এসে একটা জলপাই গাছের নীচে দাঁড়ালো। মোটা প্যাণ্টপরা যমদুতের মত লোকটা এগিয়ে এসে বলে।

—গুড মর্নিং স্যার, আরে খোকনবাবু যে। অলরাইট?

মেলার পুরোনো খদ্দের এরা। মতিবাবু ওদের বলেন।

—এসো সাহেব। তোমরা না এলে মেলা জমে না।

খোকন চেনে এ্যাণ্টনি সাহেবকে। এ্যাণ্টনি এগিয়ে এসে পাশের

পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বার করে বলে—টেক ইট খোকন সাব।

খোকন মিত্তির এদিক-ওদিক চেয়ে ওই দ্রব্যটা পকেটস্থ করে বলে।

—তাহলে খুঁটি গাড়ো এ্যান্টনি সাহেব। ওই চত্বরটাই লেগে যাবে তোমাদের?

—জরুর। বলে ওঠে সাহেব। সাহেব বলে।

—ডায়নামো বসবে, স্টাফ টেণ্ট হোবে, টিকিট কাউণ্টার, হাতি টাইগার সব থাকবে। জায়গা বেশী লাগবে।

মতিবাবু বলেন—ঠিক আছে সাহেব। তা অন্য সবরা কোথায়?

মতিবাবু ছ'চোখ দিয়ে ওই নোতুন আসা লোকজনদের মাঝে কাকে খুঁজছে, সেই উড়ন্ত নালপরীকে মনে পড়ে। এ্যান্টনি বলে।

—বাকী স্টাফ কাল এসে যাবে স্যার বাই এনাদার ট্রাক, ম্যানেজারভি আসবেন। পয়লা রিং মাস্টার এসে গেলো এ্যা।

হাসছে এ্যান্টনি ঠা ঠা করে।

শূন্য বাগানটা ক্রমশঃ ভরে উঠছে, দোকান-পশার বসছে, এক এক লাইনে এক এক জিনিসের দোকান।

অন্যদিকে মন্দিরে চুনকাম চলেছে, বৎসরের বাকী ক'টা মাস এই মন্দিরে তেমন যাত্রী আসে না। দেবতা থাকেন এক কোণে পড়ে এই বাগানের মধ্যে।

এই ক'দিন ওখানের দেবতারও ঘুম ভাঙবে। মতিবাবু ওসব দেখে শুনে আসছেন। ওদিকে কাদের আসতে দেখে চাইলেন।

ক'টা গরুর গাড়ি পথ ছেড়ে মেলায় ঢুকে সার বেঁধে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালো। গাড়ি নামায় গাড়োয়ানরা।

আগের গাড়ি থেকে জনার্দন নামছে, পরনে গলাবন্ধ কোট, কোমরে চাদরটা গিঁট বাঁধা, চোখে নিকেলের চশমা, সিধে না চেয়ে নীচের দিকে চেয়ে সেজবাবুকে দেখে এসে গড় হয়ে প্রণাম করে

জনার্দন বলে—শ্রীচরণ দর্শনে এলাম বাবু! একটু পদধূলি ছ্যান।

মতিবাবু দেখছেন অন্য গাড়িগুলোকে। মেয়েগুলো ছইয়ের বাইরে মুখ বের করে কলরব করে, মতিবাবু শুধোন—সব কুশল তো জনার্দন, হেমন্ত কই?

ভারি গতর নিয়ে নামছে দলের প্রবীণা মালিকান।

—এই যে গো বাবুমাশায়, বছরে তবু ক'টাদিন দর্শন পাই, তবে শরীলের যা ভাব-গতিক, কদ্দিন আর দল চালাতে পারবো কে জানে? কই লা বাসি, সেজবাবুকে পেন্নাম কর। মনিষ্যি নন দেবতা রে!

বাসিনীর তখনও নেশার খোয়াড়ি ঠিক ভাঙেনি। ঢুলু ঢুলু চোখ টসটসে যৌবন ওর সর্বাঙ্গে, এলোথেলো শাড়িটা নিটোল হাঁটু অবধি তুলে আধ আঢুড় গায়ে নেমে একটু টলে গিয়ে সিধে হতে হতে বলে।

—মাইরী মাসী। কতো ছ্যাবতাই না দেখালে—ই আর কুন ছ্যাবতা গ? কাঁচাখেগো ছ্যাবতা না কি?

দেখছে সে মতিবাবুকে।

খোকন মিস্ত্রিরও দেখছে নতুন মেয়েটিকে।

মতিবাবুর চোখেও লেগেছে নতুন এক নেশা। ওই মেয়েটির কথায় হাসছে তখনও মতিবাবু। বাসিনীর কথায় হেমন্তবালা গর্জে ওঠে চাপা স্বরে।

—আ মরণ ছুঁড়ির! রাজাবাবু লো—রাজাবাবু!

মেয়েটাকে দেখছেন মতিবাবু, একরাশ কোঁকড়ানো চুল পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, উন্নত বুকের নিটোল রেখাটা সোচ্চার, তাকে বশে আনার কোন চেষ্টাই নেই।

বাসিনীর এবার যেন খেয়াল হয়। বলে ওঠে সে।

—তাই বলো! পেন্নাম হই রাজাবাবু, শ্লা মনে কিছু করো না মাইরী, মানুষ দেখে দেখে আর শ্লা মানুষের বাছ-বিচেরই করতে পারি না। মনে হয় সবাই ওই ঘেয়ো কুকুরের দল।

খোকন মিত্তিরও এসে জুটেছে, এদের ঠাঁই দিতে হবে।

জনার্দন চিনেছে তাকে।

মতিবাবু বলেন—যা খোকন, এদের ওই দিকের বাসাগুলো দেখিয়ে দে গে, যাও হেমন্ত, পরে কথা হবে। এখন জিরোও গো।

জনার্দন ধমকাচ্ছে বাসিনীকে—কি রে তুই! মানীর মান রাখতে জানিস না? এমনি নেশা করা কেনে?

এবার মেলায় টুরিং সিনেমা আনছে রবি সরাওগী। মেলার এদিকে তাদের তাঁবু পড়েছে, বাদল ডাক্তার ওখানেই থাকে বেশিরভাগ সময়। সে এই নিয়েই আছে।

গঞ্জের গোটা তিনেক সাইকেল রিকশায় চোঙ লাগিয়ে আর যদু বায়েনের ফুটো জগঝম্প-নাকাড়ার দলকে সেই সব রিকশায় চাপিয়ে লাল নীল হ্যাণ্ডবিল বিলি করতে পাঠাচ্ছে সে এন্তার বাজিবাজনা বাজিবে।

পাড়ার মস্তান ফিঙে এর মধ্যে ফিট হয়ে রিকশায় বসে চোঙায় মুখ দিয়ে ঘোষণা করছে।

—আ-সম্‌-ন দারুণ রগরগে সিনেমা—'কলিজা খানে বালি' শ্রেষ্ঠাংশে—প্যার কুমারী, আইরনকুমার, পরভেজ পাপিয়া, রবি টকিজ—গুপীবাগান মেলায় চলে আস্‌সুন। জনম স্‌-সার্থক করুন। মনমাতানো গান, বুক ভাঙা—নাচ!

আর সেই সঙ্গে ধুম কড়াকড় মিউজিক চলেছে জগঝম্প পার্টির। ওরা বের হয়ে গেল গ্রামের দিকে।

বাদল ডাক্তারের সাধ সেইই সেক্রেটারী হবে মেলা কমিটির, কিন্তু খোকন মিত্তিরকে হঠাতে পারেনি এখনও। তবে রবি সরাওগীর এই খাতে কিছু আমদানী দেখাতে পারলে রবি ঠিক মেলার কর্তৃত্ব গ্রাস করবেই, তখন বাদল ডাক্তার সেক্রেটারী হবেই এই মেলার।

অবশ্য বাদল ঘোষ ছাড়াও রবি সরাওগীর কৃপাপ্রার্থী আছে মদন

সাহা। সেও করিৎকর্মা ব্যক্তি, মদনই পথটা বের করেছে। বাদল ডাক্তার সব শুনে বলে।

—ওসব করিস না মদন, যদি কেউ টের পায়।

মদন বলে, কাকপক্ষীতে টের পাবে না। ফিণ্ডের দলবল থাকবে। এ ব্যবসাতে লাভ কত্তো জানো মাইরী? স্রেফ জল বেচা পয়সা।

মদন সাহার দিশী মদের কারবার, গঞ্জের ওদিকে ধানকলের পাশে তার চোলাই মদের দোকান। ওখানে অনেকেই পায়ের ধুলো দেন। মদন এই কারবারে ফুলে উঠেছে। মদন জানে মেলায় বহু লোকের আনাগোনা হবে। শীতের রাত। ইদানীং মালের ঘাটতিও বাড়বে। নগদ টাকা আমদানী হবে খুব সোজা উপায়ে। রাতের অন্ধকারে এখানেও দু-নম্বর ব্র্যাঞ্চ খুলতে চায় সে। অবশ্য গোপনে।

বাদল ডাক্তার বলে—ওসব ঠিক নয় রে।

হাসে মদন। বলে সে—ও নিয়ে ভেবো না। কিছু আমদানী করে নিই, অবশ্য তোমাকেও কিছু দেব।

বাদল ঘোষের হাতে মদন কড়কড়ে একশো টাকার নম্বরী নোট একখানা এগিয়ে দেয়।

বাদল ডাক্তার ইতি-উতি করে বলে—এসবে আমি নেই।

হাসে মদন সাহা—চুপ করে চোখ বুজে থেকো, মেলা কমিটির মেম্বার তুমি, বুঝলে ডাক্তার, তোমাকেই এবার সেক্রেটারী বানাবো। জাত ঘুঘু ওই শালা খোকন মিস্তিরকে হঠিয়ে দেব জরুর। আর মতিবাবুও এবার কাটবে। দেখে নিও। এবার রবি সরাওগীকেই আনবো।

কে জানে কি হবে। প্রকাশ্যে মদের কারবারে যেতে চায় না।

বাদল ঘোষ সিনেমা নিয়ে পড়েছে রবি সরাওগীর হয়ে।

ওদিকে উঠেছে সার্কাসের তাঁবু। এ্যান্টনি সাহেব তখনও দাঁড়িয়ে গলায় মদ ঢালছে আর চীৎকার করছে—ঠিক সে খিঁচো আরিয়া—হাপিস।

ঘামছে এ্যাণ্টনি তবু লোকটার খাটুনির বিরাম নেই। ওদিকে দলের মস্ত ট্রাকও এসে গেছে।

—হ্যাল্লো।

কার ডাকে চাইল এ্যাণ্টনি—জুলি এসে গেছো।

পরনে হাঁটুর উপর অবধি স্কার্ট, ফর্সা রং নিটোল দেহ। মেদ নেই, বুক আর নিতম্বের মাঝে সরু কোমর যেন হাতে ধরা যায়। বুকের রেখাগুলো স্পষ্ট, ওকে দেখে মনে হয় যেন খাপখোলা তলোয়ার ঝকঝকে ইস্পাতের টুকরো।

জুলিকে এ্যাণ্টনি কাছে টেনে নেয়—মাই সুইটি।

জুলি এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়ে বলে—খেয়েছো কিছু? না ওই মদই গিলে চলেছো? দাঁড়াও।

লোকটা কাজ পাগল, জুলি এর মধ্যে ওদিকের কিচেন রুমে গিয়ে হাজির হয়।

—এ্যাই নাথন্! বেঁটে লোকটা জুলির ডাকে এগিয়ে আসে। জুলি বলে—কিছু ফিস রোস্ট, সবজী আর দুখানা ব্রেড দাও।

নাথন্ এগিয়ে আসে। শুধায় সে।

—তুমি খাবে জুলি? আভি দিচ্ছি।

জুলির পিছনে নাথন্ ঘোরে পোষা কুকুরের মত, লোকটা সার্কাসের জোকার, অন্য সময় যেমন লোক হাসাতে পারে এখন ও তা নয়। কালো—লম্বা নাক—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর চোখে, যেন এখন ও একটা মূর্তিমান শয়তান। জুলির জন্য সব করতে পারে সে।

জুলি বলে—একটা প্লেটে করে দাও নিয়ে যাবো।

নাথন্ কিচেনবয়কে দিয়ে ওসব প্লেটে এনে জুলির হাতে দিতে সে চলে যায়। সন্দেহ হয় নাথনের জুলি যে কার জন্য ইদানীং এত ভাবছে তা জানে, তবু একবার দেখতে হবে তাকে। নাথন্ অনেকদিন ধরে জুলির পেছনে লেগে আছে। মেয়েটা পাত্তা দিতে চায় না। তবু নাথন্ আশা ছাড়েনি। ইদানীং জুলির অবহেলা তাকেও বদলে

দিয়েছে। নাথন দেখে খাবার এনেছে জুলি এ্যাণ্টনির জন্য।

—খানা খা লেও।

—তুই দেখছি আজীব লেড়কি জুলি। সাবাস!

খিদেও পেয়েছিল এ্যাণ্টনির। গোগ্রাসে গিলতে থাকে। ওকে দেখছে জুলি।

বলে সে—মালিকের জন্য এত খাটছো কেন? মালিক কি দেয় তোমাকে?

এ্যাণ্টনি হাসে—মালিক না দিক, মালিকের মেয়ে তো অনেক দিতে চায় রে। কতো খানা দিল!

জুলির বাবারই সার্কাস। পেরেরা সাহেব এদিকে হাড়-কেপ্পন! জুলি এ্যাণ্টনির কথায় ফুঁসে ওঠে—ফের ওই সব কথা!

এ্যাণ্টনি ওকে কাছে টেনে নেয়—তু বহুৎ ভালো জুলি! বহুৎ আচ্ছা লেকড়ী!

তাঁবুর ওদিকে চট—জানোয়ারের খাঁচার আড়ালে দাঁড়িয়ে নাথন্ দেখছে ওদের।

নাথনের গায়ের গন্ধ পেয়ে খাঁচার বাঘটা গজরাচ্ছে—গর-র-র আবছা অন্ধকারে দু'চোখ জ্বলছে ওর। নাথন্ খেয়াল করে না।

মেলায় মেলায় পুতুল নাচের দল নিয়ে ঘুরছে নটবর পাল অনেকদিন থেকেই। নিজে পুতুল গড়তো, কুমোরের ঘরের ছেলে। মাটির পুতুল গড়তে গড়তে একদিন কাঠের পুতুল—ন্যাকড়ার পুতুল গড়তে শুরু করে।

তারপরেই ব্যাপারটা মাথায় আসে। মরা পুতুলগুলোকে সে জীবন্ত করে তুলতে পারে। নটবর কান্দীর রাজবাড়ির রাসের মেলায় ওমনি পুতুল নাচ দেখাচ্ছে।

মরা পুতুলগুলো নাচছে বাজনার তালে তালে, হাত পা ছুঁড়ছে পেছনে বাঁধনদার গাইছে। বৌ পুতুল, মেমপুতুল, অনেক রকম

পুতুলের নাচ চলেছে।

নটবর নিজেই তেমনি পুতুল সব বানিয়ে নিজেই ছোটখাটো তাঁবু করে আরও দু একজনকে নিয়ে পুতুল নাচের দল করেছিল।

সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা।

নটবর তখন ভরযোয়ান। দেখেছে মেলায় তার পুতুল নাচের দলের বেশ নামডাক। বায়নপত্রও আসছে।

মেলায় মেলায় ঘোরে নটবর। গ্রীষ্মের সময় থেকেই মেলা আর থাকে না, ঝড় জল—কালবৈশাখীর উৎপাত শুরু হয়। তারপর বর্ষা নামে। রাঢ়ের আদিগন্ত ক্ষেত সবুজ হয়ে ওঠে। মেঘ জমে নীল আকাশে। কালো মেঘের পুঞ্জ, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। বসুমতী তখন সবুজ, শস্যপূর্ণা।

আবার শরতের ছোঁয়া আসে।

কালো মেঘের যবনিকা সরে গিয়ে নীল আকাশ বের হয়, সবুজ ধান ক্ষেতের বুকে আলের মাথায়, নদীর চর ভূমিতে কাশ ফুলের সাদা উত্তরী কাঁপে হাওয়ায়।

আউস ধান উঠেছে—কার্তিকসাল ধানে এসেছে হলুদ আভা। ওই মেলার দোকানদার, পুতুল নাচিয়ে, লেটোর দলের অভিনেতারা বাতাসে শোনে ঘর ছাড়ার ডাক।

সাজ সাজ রব পড়ে আবার।

মেলায় মেলায় চলছে তাদের পরিক্রমা। বেশ কয়েকমাস অভাব, কষ্ট আর শান্ত গতিহীন জীবনের মাঝে তারা বন্দী ছিল, এবার এসেছে পথের ডাক।

ক'মাস ধরে তারা লোকের মনোরঞ্জনের জন্য নোতুন পালা বেঁধেছে, গান তুলেছে। সে সব নিয়ে বের হয়ে পড়বে। এতদিনের হারানো সেই বিভিন্ন জীবনের পথ চলতি মানুষগুলোকে দেখতে পাবে আবার।

নটবরও বের হয় পুতুল নাচের পশরা নিয়ে মেলায় মেলায়।

আরও একটা আকর্ষণ আছে নটবরের।

মেলার এই যাযাবর জীবনে হঠাৎ ক'সন আগে দেখেছিল হেমন্তকে। হেমন্তবালা তখন ঝুমরীর দলে নামকরা নাচিয়ে হয়ে উঠছে।

মাজা রং—চোখদুটো ডাগর আর কি যেন ঝিলিক মারে সেই চোখের হাসির আভায়। ওকে দেখেছিল সেবার মুরুট এর বাদশাহী সড়কের দীঘির ধারে।

কেশেরপাড় এর মেলায় পুতুলনাচের আসর শেষ করে চলেছে দইদে বৈরাগী তলার মেলায় দল নিয়ে নটবর। ধূলিধূসর মাটির সরণি, লোকে বলে বাদশাহী সড়ক। কোনকালে হোসেন শা নাকি এই পথ তৈরী করেছিলেন। তখন হাঁক ডাক ছিল। পথের ধারে মাঝে মাঝে রয়ে গেছে বিরাট দীঘি, ভাঙা মসজিদ। যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থাও ছিল হয়তো সেখানে।

এখন শস্যরিক্ত, নির্জন ধূ ধূ মাঠের মাঝে ওই পথটাই একা পড়ে থাকে কি শূন্যতা নিয়ে। কিছু পথচলতি মানুষ, গাড়োয়ানের দল গাড়ি ছেড়ে গরুগুলোকে বিশ্রাম দেয়, দীঘির ধারে বটগাছের ছায়ার মাটির উনুনে ভাতে-ভাত সিদ্ধ করে নেয় সেই অবসরে।

নটবরের দলও চলেছে গরুর গাড়িতে মালপত্র নিয়ে ওই পথে। সন্ধ্যা নাগাদ মেলায় পৌছবে। ওরা দুপুরে গাড়ি থামিয়ে ওই দীঘির ধারে স্নান খাওয়ার আয়োজন করছে।

চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ। গ্রাম বেশ দূরে।

হঠাৎ এই নির্জনে নটবর মেয়েদের দেখে একটু অবাক হয়। হাসা-হাসি করছে ওরা নিজেদের মধ্যে।

নটবরকে দেখে শুধোয় মেয়েটি।

—কিসের দল গো বাবু মশায়ের?

চাইল নটবর।

ওদিকে দলের পঞ্চানন মাটির হেঁটেল যোগাড় করে উনুন বানিয়ে

ভাত চাপিয়েছে। নটবর চাইল মেয়েটির ডাকে। সন্তস্নান সেরে মাথার একরাশ চুল চুড়ো করে বাঁধা, টিকালো নাক, হাসিটা কাঁচের চুড়ির রিনি রিনি সুরে যেন সুর মিশিয়েছে। নটবর চাইল। জানায় সে।

—পুতুল নাচের দল, দৈইদে বৈরাগীতলার মেলায় যাচ্ছি, কেশেরপাড়এর মেলা থেকে।

মেয়েটি দেখছে ওকে। বলে সে।

—আমরাও তো চলেছি ওখান থেকে তা বাবু বিচিত্তির ব্যাপার। এক পথেই ঘুরছি কিন্তু দেখা হয় নাই একদিন!

পুতুল নাচ-এর দল তো মনে হয় ভালোই চলে গো তোমার?

নটবর বলে—চলছে কুনমতে। তোমাদের কিসের দল গো? হেসে ওঠে মেয়েটি খিলখিলিয়ে। হাসলে ওকে সুন্দরই দেখায়।

মেয়েটি বলে—দেখেও চিনতে পারোনি গো? ক্যামন মানুষ তুমি বাবু? আবার বলছো মেলায় মেলায় ঘোরো? আমাদের সবাই চেনে গো? আমাদের গায়ে মুখে ছাপ মারা আছে দেখনি?

হাসে নটবর।

দেখতে থাকে সে কোন মার্কা টার্কা আছে কিনা ওই মুখে চোখে। কিন্তু তেমন কিছুই দেখে না। নটবরের ওই সহজ সরল চাহনিটা ভালো লাগে মেয়েটির।

বলে সে—কি দেখছো অধিকারী?

নটবর সলজ্জ ভাবে বলে—কই না তো? কিসের দল তা তো বল্লে না?

মেয়েটি তাকায়—ঝুমরির দল গো। মেলায় মেলায় গান গেয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে মানুষের পকেট কাটি, মন ভোলাই।

নটবর দেখছে ওকে।

দেখেছে বটে মেলায় অনেক ঝুমুরের দলকে। নটবর বলে,

—তাই বলো! ওতো ভালো গো। শিল্পকর্ম।

গান নাচ এসব খারাপ কেন হবে?

মেয়েটি দেখছে নটবরকে।

তাদের সম্বন্ধে এসব কথা বলে, এমনি ভাবে এসব কথা আগে জানতো না মেয়েটি।

সে বলে—তুমি দেখছি খুব সোজা মানুষ গো। ভয় নাই—তোমার পকেট কাটবো না।

নটবর বলে—পকেটে কিছু থাকলে তো কাটবে। পুঁজি তো ব্যাঙের আধুলি। কি আর চুরি করবে বলো?

মেয়েটি বলে—তার চেয়ে বড় কিছু চুরি করতেও তো পারি। ধর মনটাই যদি চুরি হয়ে যায়?

হাসছে নটবর!

মেয়েটি বলে—আমার নাম হেমন্তবালা।

ওদিক থেকে কার ভরাটি গলার হাঁক-ডাকে চাইল হেমন্ত। মোটা মতো একটি মহিলা হাঁকছে।

—বলি অ হেমি, ভাত যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল রে। খেয়ে দেয়ে পাট চুকিয়ে আবার গাড়ি ছাড়তে হবে, বৈকাল হয়ে গেল। আয়, খিদে তেষ্টা কি নাই তোর?

হেমন্ত বলে—নোতুন নাগর পেয়ে খিদে তেষ্টাও ভুলে গেছি মাসী। যেছি গো!

নটবর একটু লজ্জা পায় মেয়েটির কথায়।

হেমন্ত সেদিকে বেপরোয়া। বলে সে নটবরকে।

—চলি গো অধিকারী, মাসী ছটফট করছে—ভাবছে ছুঁড়ি বুঝি কাটলো এবার নোতুন মানুষ পেয়ে। চলি, মেলায় গে তোমার পুতুল নাচ এবার দেখাবো মাইরী, জানাশোনা হয়ে গেল।

হঠাৎ বাতাসে কিসের গন্ধ শুঁকে বলে পঞ্চাননকে।

—ওগো রসুইদার, হাঁ করে দেখছো কি? এদিকে ভাত যে ধরে গেল বাপু!

মেয়েটি চলে গেল হাসতে হাসতে।

নটবরের দলের রসুইদার পঞ্চানন দেখছিল মেয়েটিকে। সে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে বলে।

—ওকে চেনো অধিকারী?

নটবর চাইল। পঞ্চানন বলে—খুব ভালো নাচ-গান করে গো। আর দেখতেও কেমন খাসা।

নটবর ধমকে ওঠে—থাম তুই। ভাত হয়েছে তো নে, খেয়ে দেয়ে গাড়ি ছাড়তে হবে। তাগাদা কর বাপু।

নটবর কি যেন স্বপ্ন দেখছে।

মেলায় এসে মেলার ভিড়ে আর তার দলের তাঁবু টাবু গেড়ে লাল সালুতে আঁকা পুতুলনাচের বিজ্ঞাপনগুলো টাঙিয়ে খেলা শুরু করার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

খেলা শুরু করেছে।

জমাটি মেলা। লোকজন দর্শকের অভাব নেই। নটবর খেলা জমিয়ে তুলেছে। এখানে সাত দশদিন ভালো আমদানীই হবে। মনটা বেশ খুশি খুশি!

তবু এই ফাঁকে মনে পড়ে একজনের কথা।

দীঘির গহীন জলের ধারে বটগাছের ছায়া নামে রিক্ত প্রান্তরে। সেই আশ্রয়ে দেখেছিল মেয়েটিকে। বারবার তাকেই মনে পড়ে।

আজকের শো হয়ে গেছে। তাঁবুটা ফাঁকা—পুতুল-এর স্তূপের সামনে একটা চটের উপর বসে হিসাব করছে নটবর। আজকের আমদানীর হিসাব। পঞ্চানন—ঢোলওয়ালা ওরা গেছে এই ফাঁকে মেলা দেখতে।

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে চাইল নটবর।

—তুমি?

ওকে এসময় এখানে দেখবে ভাবেনি নটবর। চোখে কাজল,

মুখে হাল্‌কা রং-এর আভাস। বিচিত্র লজ্জাময়ী একটি মেয়ে। সেই দীঘির ধারে দেখা শান্ত ঘরোয়া রূপটাকে কি অপরূপা করে তুলেছে।

হাসছে হেমন্ত—চিনেছো তাহলে ?

মেয়েটি বলে—তোমার পুতুল নাচ দেখলাম গো আজ। হ্যাঁ, খাসা নাচ বাপু। হাতে তোমার জাদু আছে ওস্তাদ। হাতের টানে মরা পুতুলও জ্যান্ত হয়ে ওঠে।

হাসছে হেমন্ত।

নটবর খুশি হয়েছে। বলে সে।

—তাহলে তোমার নাচ গানও একদিন দেখতে হবে ?

মেয়েটির মুখে কি বিষণ্ণতার ছায়া নামে। দুচোখের হাসি মুছে গেছে। কণ্ঠস্বরের সেই চাঞ্চল্যও নেই। বলে হেমন্ত।

—ও আর দেখে শুনে কাজ নাই অধিকারী। ওখানে গান যা গাই তা পোড়া পেটের দায়ে, তোমার এ কাজে কিছু শিল্পকম্মো আছে, আনন্দ আছে।

আমাদের ওসব কিছু নাই আছে শুধু গরল আর জ্বালা গো। সেই গরলে জ্বলে গেলাম।

নটরব দেখছে হেমন্তকে।

মেলায় পরিচয়। আবার এ হাট থেকে চলে যাবে অন্য হাটে।

দেখা হয় তবু। দুজনে যেন দুজনের অনেক কাছে এসে গেছে।

···আবার গ্রীষ্ম নামে। এবছরের পালা শেষ।

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে মোলপুরের মেলায় সেই দেখা হয় দুজনে।

হেমন্ত বলে—আবার কবে দেখা হবে কে জানে অধিকারী। পথে পথে ঘুরি, তবু মন চায় দেখা আবার হোক।

নটবর কি স্বপ্ন দেখে!

নদীর ধারে শালবনে এসেছে হলুদ পাতার রাশি। বছরের সবুজ পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। বাতাসে ওঠে শাল মঞ্জরীর উদাস সুবাস। বালুচরে নেমেছে রাতের শুভ্র শূন্যতা। কোথায় একটা রাত-

জাগা পাখি ডেকে চলেছে।

নটবরও জানে, ক'মাস ঘরে বন্দী থাকতে হবে তার গ্রামে। মেলার এই আলো ঝলমল পরিবেশ নেই, নেই গানের আসর। সব কেমন স্তব্ধ। শূন্য।

নটবর বলে—শহরে ফিরবে তো হেমন্ত?

হেমন্ত বলে—হ্যাঁ। যদি বেঁচে থাকি দেখা হবে আবার আসছে বছর।

নটবর কথাটা ভেবেছে।

তার শূন্য ঘরে ওকে নিয়ে যাবে। দুজনে এই যাযাবর জীবন থেকে একান্তে সরে গিয়ে ঘর বাঁধবে। কথাটা সোজাসুজি জানাতে পারে না।

নটবর বলে—এমনি করে পথে পথে ঘোরায় লাভ কি হেমন্ত। ঘর বাঁধলেই তো পারো?

হাসছে হেমন্ত। জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনাকে ওই হাসি দিয়ে ঢেকে চলেছে ওরা। হেমন্ত চাইল ওর দিকে। বলে সে।

—ঘর! আমাদের জন্যে কোথাও কোন ঘর নাই অধিকারী। এ পথের নেশায় সব কেড়ে নেয় গো। আর তোমাকেও বলি অধিকারী, তুমিও এসব ছেড়ে দিয়ে ঘর বাঁধো। তবু সুখে থাকবে। পথে পথে ঘোরার মত কষ্ট আর নাই গো! চলি!

হেমন্ত চলে গেল, আবছা অন্ধকারে আর দেখা যায় না ওকে।

নটবর কথাটা বলতে চেয়েছিল আজ। কিন্তু হেমন্তবালা সব জেনেও কৌশলে তাকে এড়িয়ে গেল।

নটবর এবছরের মত পুতুলনাচের পালা শেষ করে ফিরেছে।

দেখে গ্রামে তার আসার পরদিনই সৃষ্টিধর এসে হাজির। তরুণ ছেলেটা গ্রামে যেন তার পথ চেয়েই থাকে। নটবর বলে।

—তুই! আবার এসেছিস?

সৃষ্টিধর হাসে। সলজ্জ হাসি। ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে

নটবর। ওকে কিছুতেই তাড়াতে পারেনি। তাদেরই স্বজাত। ছেলেটার পুতুল গড়ায় হাত খুব ভালো। গ্রামের ইস্কুলে পড়াশোনা করেছে ক্লাস নাইন অবধি।

মা বাবা কেউ নাই।

এর শালে—ওর বাড়িতে কাজ করে দিন কাটায়, দুবেলা খেতে পায়, তাতেই খুশি।

সৃষ্টিধর বলে—এবার অনেক নোতুন পুতুল গড়েছি ওস্তাদ। ওই ছুটছাট্‌ পুতুল নয় গো! পালাবন্দী পুতুল নাচ করো, রামায়ণের একটা ছোট পালাও বেঁধেছি—পুতুল দিয়ে করানো হবে।

নটবর দেখছে ছেলেটাকে।

বলে সে—তোর ঘাড় থেকে এ ভূত নামবে না দেখছি?

হাসে সৃষ্টিধর—জানো। দেখবা নোতুন জিনিস হবে পুতুল নাচে। আমাকেও নিয়ে যেতে হবে ওস্তাদ।

নটবর বলে—বিপদে ফেললি দেখছি তুই?

হাসে সৃষ্টিধর—দল জমে উঠবে দেখবা।

নটবর ঘর বাঁধতে চায়। মনে পড়ে ওই হেমন্তের কথা। কিন্তু কিন্তু ঘরেও মন বসে না। আর এসে জুটেছে ওই সৃষ্টিধর। ছেলের গলাও ভালো। পালা বেঁধেছে চমৎকার। পুতুলগুলোকে ওই পালার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় করাতে পারলে সত্যি চমক আনতে পারবে।

সৃষ্টিধরও উৎসাহ নিয়ে লেগে গেছে।

ক'বছর আগেকার কথা। এখনও নটবর ওই পুতুলের সংসারি থেকে সরে যেতে পারেনি। বয়স হয়েছে।

সৃষ্টিধরই দল চালায়, পালা বাঁধে। এখন খুব নাম ডাক তার। নটবর রয়ে গেছে দলে, মালিক হয়ে। দল চলে সৃষ্টিধরের নামে। খুব নামী দল করেছে সৃষ্টিধর।

সৃষ্টিধর বারুইয়ের দলও এসে পৌঁছেছে মেলায়।

তাঁবুর একদিকে মঞ্চমতো করা—বাঁশের সঙ্গে কাপড়-চাদর জড়িয়ে পর্দার আড়াল করে মঞ্চ তৈরী হয়।—নীচে থেকে রকমারি পুতুলের হাতে-পায়ে সুতো বেঁধে আঙুলের টানে তাদের হাত-পা ঘাড় মাথা নাড়িয়ে অভিনয় করায়। পিছনে চলে পালার অভিনয় বা গান।

বাইরে থেকে দেখে সৃষ্টিধরের ভালো লেগেছিল। কেমন অন্য জগৎ, ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব, সীতা-হরণ, রাবণবধ নানা পালা গায় ওই নটবর।

বলে নটবর—ওরা করে না, করাতে হয়। এ যেন ছোটখাটো এক ভগমানের সংসার হে। ত্যানাকে দেখা যায় না—কিন্তু দ্যাখো বিশ্ব-চরাচর ত্যানার আঙুলের ডগেই নাচছে। তিনিই যা করাবার তাই করছি।

এ-ও তাই, তুমিই ওই মরা-পুতুলদের, রাজরাণী তৈরী করছো, খেলাচ্ছো—নাচাচ্ছো। তখন জীয়ন্ত ওরা, পালা ফুরোলেই সব ঠাণ্ডা। শেষ। মানুষের জেবনের মতই হে!

সৃষ্টিধরও কথাটা ভাবছে। কি যেন গভীর তত্ত্ব-কথা।

নটবর দেখছে ছেলেটাকে, মনোযোগ আছে ওর। আর পালের বংশ, জাত-শিল্পী ওরা। নটবর বলে।

—শিক্ষে দিয়ে দেব, শুধু হাতের এই দশটা আঙুলের খেলায় কত হাসি-কান্নার ঢেউ বইবে, তুমি শিল্পীর ঘরে ছেলে, এ তোমার হবে!

সৃষ্টিধরেরও বাঁধন কিছু নেই। গোকর্ণের ওদিকে একটা গ্রামে কোন দূর-সম্পর্কের এক মামার কাছে থাকে, মাটির হাঁড়ি-কলসী মেলার মরশুমে গোয়ালিনী পুতুল, আহ্লাদী-বৌ, হুঁকো-হাতে বুড়ো, সবৎসা গাভী, এইসব গড়ে মেলায় আনে। দু'বেলা কোনমতে খেতে জোটে মাত্র, তাও অনেক গঞ্জনা সয়ে।

তাই এই প্রাণহীন পুতুলের জগতেই যেন আনন্দ পেতে চায়। কাঠের কাজও শিখেছে ফটিক ছুতোরের কাছে।

সৃষ্টিধরের সখ হয় এবার নিজেই কিছু নাচের পুতুল বানাবে

হালকা কাঠ দিয়ে, যাতে নাচগুলো—যুদ্ধের দৃশ্যটা বেশ সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

নটবর ওকে চুপ করে ভাবতে দেখে বলে—কি ভাবছো? আসবে দলে?

মেলা থেকে মামার ওখানে যায়নি তরুণ সৃষ্টিধর। দলেই ভিড়ে যায়।

নটবর বলে—কাহিনীটাও জানতে হবে সৃষ্টিধর। লবকুশ, কর্ণবধ, ধ্রুব এসব কাহিনী। ও মুখে মুখে শুনিয়ে দেব—

—ওসব কিছু কিছু জানি! নতুন পালাও করতে হবে মাস্টার।

সামাজিক চলতি পালা গো!

আর ভালো কলের গান একটা চাই—নোতুন উঠেছে, ব্যাটারিতে চলে, বড় রেকর্ড বাজে ঝম-ঝম করে। আর বড় আসর হলে মাইক লাগবে! দু'-চারটে বিজলীর আলোও হলে ভালো হয়।

নটবর এসব ভাবেনি।

দিন এগোচ্ছে, সেই সাবেকী ন্যাকড়ার পুতুল আর পিছনে খালি গলায় গান, ঢোলের তালে-বেতালে নাচ দেখিয়ে আর দিন চলবে না।

তার এতদিনের নিজের হাতে গড়া দল না হলে টিকবে না।

নটবর বলে—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার রে?

সৃষ্টিধর বলে—জমিয়ে গান করলে ও টাকা উঠে আসবে এক মেলাতেই। হ্যাণ্ডবিল দেবো—দেখবো কি হয়?

বৃদ্ধ নটবরেরও নেশা চেপে গেছল। আশপাশের গাঁয়ে চারিদিকে হ্যাণ্ডবিল ছেপে বিলি করছিল সৃষ্টিধর। সে জানে বিজ্ঞাপনের যুগ, চমকের যুগ, পুতুল নাচকেও ঢেলে সাজিয়েছে সে।

মেলায় ডি. এম. জেলা প্রচার-আধিকারিকও এসেছেন। কলকাতার কাগজের রিপোর্টাদের, কিছু বিদেশী টুরিস্টকে গ্রাম-বাংলার লোক-সংস্কৃতির পরিচয় স্বরূপ এই মেলা দেখাতে।

সকালে ওরা ক্যাম্পের সামনে গাছের নীচে চায়ের আসর

বসিয়েছেন, সৃষ্টিধরকে দেখতে চাইলেন ডি-এম। ছোকরা বয়েস, ডাইরেক্ট রিক্রুট আই-এ-এস।

সৃষ্টিধর বলে—আমি পুতুল খেলার দল নিয়ে মেলায় এসেছি হুজুর। নোতুন ঢঙে পুতুলনাচ দেখানোর চেষ্টা করছি, যদি একবার আপনারা দেখতে যেতেন—

ডি-এম দেখছেন সৃষ্টিধরকে।

জেলা প্রচার-আধিকারিক মুখ চেনেন, মেলাতেই ঘোরেন তিনি। অতিথিরাও দেখছেন ওকে। প্রচার-আধিকারিক বলেন—আজ সন্ধ্যায় প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, কবিগানের আসর আছে।

ডি-এম বলেন—তবু একবার যাবো ওখানে, বেচারা নিজে বলতে এসেছে।

সৃষ্টিধর দেখছে তরুণ ডি-এমকে।

—ঠিক আছে, সন্ধ্যা সাতটায় যাবো তোমার ওখানে। বেয়ারা যাচ্ছে জায়গাটা দেখে আসবে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না।

সৃষ্টিধর তাতেই খুশি।

তাঁবুতে এসে কথাটা শুনে বুড়ো নটবরের হুঁকো থেকে কলকে পড়ে যাবার উপক্রম হয়। ঘাবড়ে যায় সে।

নটবর বলে—এ যে ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড করলি রে ছিষ্টিধর এখন শেষ-রক্ষে হবেক কি করে? কোথায় বসাবি ওদের আর কি খেলাই বা দেখাবি ত্যানাদের?

হাসে সৃষ্টিধর—ওসব ঠিক হয়ে যাবে মাস্টার। তুমি ভেবনি! দেখো না কেমন জমিয়ে দিই।

কর্ণার্জুন রেকর্ডের পালাটাকেই সৃষ্টিধর নিজে খেটেখুটে পুতুলের সঙ্গে সেট করেছে।

অতিথিরা এসেছেন। মঞ্চের গাঢ় নীল পর্দায় আলো পড়েছে। পিছনে মাইকে বাজছে সঙ্গীতের সুর, পালার নাম ঘোষণা করে সৃষ্টিধর

সংক্ষেপে পালার কাহিনী নেপথ্যে বলে চলেছে, আর এক একটি পুতুলের চরিত্র উঠে দর্শকদের নমস্কার জানাচ্ছে।

সারা তাঁবুতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্যে সারা তাঁবু হাততালিতে ভেঙে পড়ে, আর দুঃশাসনের রক্তপানের দৃশ্য করেছে অপূর্ব।

অতিথিরা অবাক হয়ে দেখছেন।

নটবর যেন বিশ্বাস করতে পারে না সৃষ্টিধর পুতুল দিয়ে কি জাদু করেছে।

সাহেবরা কেউ চলে যান নি, শেষ অবধি দেখার পর সৃষ্টিধরকে ঘিরে ওঁরা ছবি তুলছেন, সৃষ্টিধর ধরে আনে নটবরকে, বলে।

—এই আমার গুরু, দলের মালিক সাহেব, পুতুল নাচের মাস্টার।

এ সম্মান নটবর জীবনভোর পায়নি!

ডি-এম সাহেব প্রচার-আধিকারিককে বলেন।

—এদের নাম ঠিকানা নিয়ে নিন, দরকার হবে। আর সৃষ্টিধর, সদরে এলে তুমি দেখা করো। শহরেই দু-তিনদিন যাতে কোন হলে পুতুলনাচ দেখাতে পারো তার ব্যবস্থা করে দেব।

কলকাতাতেও হয়তো যেতে হবে! যাবে তো পুতুলনাচ দেখাতে? সৃষ্টিধর যেন বিশ্বাসই করতে পারে না।

রাত্রি হয়ে গেছে।

আজ সৃষ্টিধর যেন সত্যিকার পথ পেয়েছে। আরও কিছু ভাববে সে পুতুলনাচ নিয়ে। ভাবছে আলিবাবা, না হয় আলাদিন-এর কাহিনী নিয়ে নোতুন পুতুল খেলা করবে এইবার।

চা খেতে চলেছে। পর পর দুটো শো করেছে আজ। দারুণ বিক্রি। এ মেলাতে তাদের দারুণ নাম হয়েছে। মনটা খুশি খুশি, আসছে সৃষ্টিধর। এদিকে লোকজন বিশেষ নেই, আমগাছের ফাঁক দিয়ে তারা ঝকমকানো আকাশ দেখা যায়। কার ডাকে চাইল।—মাস্টার নাকি গ?

সৃষ্টিধরের এখন বেশ নাম ডাক।

মেলায় মেলায় ফেরা ওই পশারীর দল ওকে চেনে।

এর আগেই সে দেখেছে ওই বাসিনীদের। যাতায়তের পথে—চোখে পড়ে মেয়েটিকেও। দু'একবার হাসির ঝিলিক তুলে চেয়েছে মেয়েটি তার দিকে।

আজ তাকে এখানে দেখে চাইল সৃষ্টিধর।

তারাজ্বলা আকাশ, হিম হাওয়া বয়। মেলার আলো নিভে আসছে। ঘরে ফিরে গেছে উৎসাহী দর্শকের দল। এখন পড়ে আছে মেলায় মেলায় ঘোরা এই যাযাবরের দল।

সৃষ্টিধর দেখছে ওকে।

নটবরের বয়স হয়েছে।

এখন আগেকার মত টাকার অভাব নেই দলের। সৃষ্টিধরের নামের জন্য দলের টিকিটও বিক্রি বেড়েছে। বেড়েছে দলের আয় পয়। নটবর মনে মনে বেশ খুশী।

তারই হাতে গড়া সৃষ্টিধর এখন বড় হয়েছে। ছেলেটাও সৎ কোনরকম নেশা-ভাং করে না, টাকারও চাহিদা নেই। যা আয় হয় সবই নটবরের হাতে দেয়।

নটবর হঠাৎ বাইরে তারা জ্বলা অন্ধকারে সৃষ্টিধরকে কার সঙ্গে কথা বলতে দেখে চাইল। একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে সৃষ্টিধর।

নটবর সরে এল!

তার নিজের জীবনের কথাটা মনে পড়ে। আজ অনেককাল পার হয়ে এসেছে, সেই যৌবনের দিনগুলোকে ভোলেনি সে। মনে পড়ে আজও অনেক আঁধার পার হয়ে একজনের মুখ!

সব কেমন হারিয়ে গেছে।

নটবরের ঘর বাঁধা আর হয় নি। আজ অকারণেই যৌবনের হারানো হেমন্তের কথা মনে পড়ে।

সৃষ্টিধর চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে।

শীত শেষের ফিকে কুয়াশা নামছে, মেয়েটা এগিয়ে আসে—চিনতে পারলে না ?

—নাতো !

—চেনবা কি করে বলো ? আমিও তোমার নেয়তি গো—আজ দেখলাম তোমার পুতুল নাচ, নিয়তির গানও শোনলাম, জব্বর গান আর পালা বেঁধেছো মাস্টার।—

আমি আঁধারে বেঁধেছি ঘর,

আলোর সাগর পারে—,

দেখছে ওকে সৃষ্টিধর। হাসি দিয়ে অন্তরের জমাট বেদনাকে কি সে চেপে রাখতে চায়। মেয়েটি বলে।

—ঝুমুরদলের বাসিনীকে চেনো না ? এ জগতের সব্বাই এই বাসিনীর নাম শুনেছে গো ? পোড়াকপাল আমার ! তুমিই শোননি নামটা।

সৃষ্টিধর বলে—শুনেছি বটে। তবে তোমাদের গানের সময় আমাদেরও শো চলে কিনা তাই ঠিক দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।

বাসিনী বলে—আমাদের নাচ-গান কি দেখার মত, না শোনার মত বলো ? তোমার পালা দেখতে কত মানী গুণী লোক ভেঙে পড়ে। দেখলাম নিজের চোখে।

বাসিনীকে দেখছে সৃষ্টিধর।

তারার আলো দোল খায় দীঘির জলে।

বাসিনী বলে—একদিন দেখতে এসো আমাদের আসর ! ওইদিকে আছি। মাসীও গেছলো আজ তোমার পালা দেখতে। বুড়িও খুশি হবে তোমাকে দেখলে। চলি—

আবছা তারা-জ্বলা আলোয় মেয়েটিকে আর দেখা যায় না। চলে গেছে আমবাগানের ওদিকে।

তার দলের রাশু খুঁজছে ওকে।

—ছোটমাস্টার ! কত্তা খুঁজছে তোমায়। হিমে কোথায় বেরুলে

তাই বলছে, চলো খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

রাশুও দেখেছে ওই মেয়েটাকে। রাশু এই লাইনের পুরোনো লোক। ঢোল সানাই বাজাতে পারে। দলের টুকটাক কাজও করে।

রাশু বলে—ও ছুঁড়ি কি বলছিল গো?

ওই বাসিনী সৃষ্টিধর একটু বিব্রত বোধ করে বলে, আজ খেলা দেখে গেছে তাই বলছিল।

রাশু বলে—ওর ধারে কাছে যেও না মাইরী, আগুনের খাপরার মত রূপ-যৌবন নিয়ে ছুঁড়ি যেন আসরে তুবড়ি ছোটায় গো! সাংঘাতিক মেয়ে ওটা।

সৃষ্টিধর বলে—চিনিস ওকে?

রাশু বেশ গর্বের সঙ্গে বলে।

—ওকে চিনবো না? ওদের দলে ক'বছর ঢোল বাজিয়েছি গো, তবে হ্যাঁ—নাচিয়ে বটে একখানা। তাং বাজাও ত ফুল্‌কি ছোটাবে, রং বাজাও আসর মাতিয়ে দেবে। যা লচক আর লয়কারী ওর—তবে, কিন্তু মাস্টার শালীর ভারি ছ্যামাক।

মেলা ভেঙে আসছে, আসর, দোকান উঠে গেছে আজ রাতের মত। ওদিকে তবু ভিড় রয়েছে। এগিয়ে যায় সৃষ্টিধর। আমগাছের নীচে কানাতের নীচে আসর বসেছে। আসরে নাচছে মেয়েটি, সুঠাম লাস্যময়ী চেহারা, পিঠের বেণীটা উদ্যত সাপের মত যেন ফুঁসে ওঠে, সারা দেহে উদ্ধত যৌবনের সোচ্চার মুখরতা—এক নজর দেখেই চিনতে পারে সৃষ্টিধর। আসরে লোক ধরে না।

বাসিনী নাচছে আসরে। গানের গলাও সুন্দর।

আসরে নোট-আধুলী সিকি ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে বসে আছে বিরোধীদলের বাঁধনদার, নাচিয়ে মেয়েরা। ওরা জানে বাসিনীকে পারা যাবে না।

তাই হেমন্তবালার দলের এত নাম-ডাক। বাসিনী আসর মাতিয়ে তুলে এবার বসেছে। আসর ধরেছে প্রতিপক্ষ। আসর কেমন মিইয়ে যায়!

চলে আসছে সৃষ্টিধর, বাসিনীর ডাকে থামলো। বাসিনী ওই নাচের অবকাশেই ওকে দেখেছে।

ওকে বলে—বাহারের লোক তো তুমি! এ্যাদ্দিন পর ভাঙা আসরে নাচ দেখতে এলে? আর এলেই যদি—এমনি করে পালিয়ে যাবে নাকি? এসো—

খপ্ করে মেয়েটা সৃষ্টিধরের হাত ধরে!

চমকে ওঠে সৃষ্টিধর। দু'চোখের তারায় যেন অজানা ভয়ের ছায়া নামে। তার দলের বাজিয়ে রাশুর কথা মনে পড়ে, সাংঘাতিক মেয়ে গ উ!

—চলো, মাসীও তোমাকে দেখলে খুশি হবে।

অস্থায়ী আস্তানা। বাঁশ উলুখড়—তালপাতার সংসার।

হেমন্তবালা দেখছে তরুণ সৃষ্টিধরকে। বলে সে—বসো বাবা! তা বাবার তো পুতুলের নাইনে খুবই মান-খাতির!

হাসে বাসিনী।

—বাবা তোমরা বিধাতা-পুরুষ গো। আঙুলের টানে রাজা-রাজকন্যে-সেনাপতিকে নাচিয়ে চলে। আমাদের ভাগ্যের সুতোটা কুন বিধাতা-পুরুষের হাত বলতে পারো মাস্টার, তাকে শুধোতাম—কদ্দিন আর নাচাবে ঠাকুর?

হেমন্তবালা বলে—সবই বরাত রে। সংসারে সঙ্ সেজে সবাই নাচছি। তা চা দে বাবাকে! কইরে!

রাত্রি নামছে!

সৃষ্টিধর বের হয়ে আসছে ওদের আস্তানা থেকে। মেলার জৌলুস আর নেই। এখানের পালা শেষ।

সৃষ্টিধর বলে—ভোরেই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

বাসিনী বলে—এই তো জীবন গো, এক মেলায় দেখা হলো, আবার হারিয়ে গেলাম! আমাকেও ভুলে যাবে, নয়গো মাস্টার?

কি এর জবাব দেবে জানে না সৃষ্টিধর!

এমনি করে হয়তো সবকিছুই হারিয়ে যায়!

—মাস্টার!

সৃষ্টিধর ওর দিকে চাইল! ডাগর দু-চোখ জলে টলমল করছে।

—মনে হয় শুধু আঁধারেই জ্বলে মলাম মাস্টার তোমার পালার নিয়তির মতই! এই আঁধারের শেষ নাই, তল নাই গো! চলি—

সৃষ্টিধরের কাছে আরও কি যেন আশা করেছিল মেয়েটি। লোকে ওকে বলে মুখরা, আগুনের মত জ্বালা-আনা মেয়ে ও, কিন্তু সৃষ্টিধর দেখছে ওর বুকের জ্বালাটাকে, যা ওকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায় দিনরাত। সেই হাহাকারটাকেই দেখেছে ওই মেয়েটির কথায়, ওর চোখের জলে। এ কান্না, হাহাকার যেন চিরকালের।

খেলাল হয় বাসিনী নেই, চলে গেছে।

নিজেদের তাঁবুতে ফিরলো সৃষ্টিধর। নটবরের গোছগাছ শেষ। নটবর বলে—কোথায় ছিলি রে?

রাশুর গুণ অনেক। সন্ধ্যার পর আজ গান নেই, সে একটু দ্রব্য টেনেছে। আড়ালে সৃষ্টিধরকে দেখে বলে। গান শুনতে গেছলা মাস্টার? এ্যা ছুঁড়িটা যা গায় মাইরি! ধমকে ওঠে সৃষ্টিধর—থাম তো!

নটবর দেখছে ওকে।

ভরজোয়ান ছেলেটা হয়তো ওই ঝুমুরওয়ালির চোখেই পড়েছে।

নটবর বলে—নিজের কাজের কথা নিয়েই থাকবি সৃষ্টিধর, এসব পথ ভালো নয় রে। অনেক লোভ আসে, সব জয় করে দাঁড়াতে হবে।

সৃষ্টিধর কথা বলে না।

নটবর বলে—নে, আজ রাতের খাওয়া দাওয়া চুকলে গোছগাছ কর। মালপত্র নিয়ে ভোরেই গরুর গাড়ি ছাড়তে হবে। পরশু গিয়ে গোপীবাগান মেলায় জমতে হবে। এবার ওখানেও জমাটি মেলা হচ্ছে, মস্তিবাবুরা বায়নাপত্র পাঠিয়েছেন।

এর আগেও ওই গোপীবাগানের মেলায় গেছে সৃষ্টিধর। ওদের পথের নিশানায় এই মেলটাও পড়ে।

ক'দিন ধরে নটবরের শরীর ভালো নেই। বয়স হয়ে গেছে। সর্দি-কাশি হাঁপানির হাঁপও রয়েছে। জরাজীর্ণ হয়ে গেছে তার শরীর।

সৃষ্টিধর বলে—তার চেয়ে এবার গান শেষ করে ঘরে ফিরে যাই অধিকারী, তোমার শরীর ভালো নয়, শীতে হিমে মেলায় মেলায় আর নাই বা ঘুরলাম।

হাসে নটবর—না রে। এতকাল গেছি ওখানে, ওনারাও আশা করে আছেন। ও মেলার কত্তারাও আসবেন তোর পালা দেখতে, আর তুই কিনা বলছিস যাবি না?

সৃষ্টিধর দেখছে লোকটাকে।

বলে নটবর—নিজের কথা এখানে ভাবিস নি রে। নিজের কথা ভাবলে তো ঘরসংসার করে শান্তিতে থাকতে পারতাম, তা আর হলো কই।

এই পুতুলের সংসার নিয়েই মজে রইলাম কি মায়ায়। এ খেলার কবে শেষ হবে কে জানে?

কি হতাশা—বেদনার সুর ফুটে ওঠে, সেটা সৃষ্টিধরের নজর এড়ায় না।

বলে সে—বলছো যাচ্ছি। তবে বাপু যা শরীর গতিক তোমার না গেলেই ভালো হতো।

তবু যেতে হয় তাদের।

রাশু বুড়ো পঞ্চা—যতীনদের নিয়ে তাঁবুপত্র গুটিয়ে—মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে তারা চলেছে গুপীবাগানের মেলার দিকে রাঢ়ের প্রান্তরের বুক চিরে ধুলি-ধূসর পথ বয়ে। এপথে তারা অনেকবার গেছে। আজও চলেছে গোপীবাগানের মেলার দিকে।

রবিদাস সরাওগী এই গ্রামে এসেছে কয়েকবছর আগেই। তখনও মতিবাবুর সেজতরফের খুব বোল-বোলাও।

ওই রবি সরাওগীই সদর নায়েবকে কিছু টাকা প্রণামী দিয়ে জমিদারবাবুর কাছে গেছে। একশো একটাকা পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করে বলে।

—এখানে কিছু কাজ-কারবার করবে হামি, তাই কি বাজারে একটা দোকান ঘর চাইছি হুজুর।

মতিবাবু ফরসীর নলটা মুখে থেকে সরিয়ে তখন রবি সরাওগীকে আপাদমস্তক দেখে বলে—ঠিক আছে। নায়েব একে ব্যবস্থা করে দাও।

রবি সরাওগী তখন ছোটখাটো একটা কাপড়ের দোকান দিয়েছিল, তারপর ক্রমশ স্থচ হয়ে ঢুকে এখন ফাল হয়ে উঠেছে। ওদিকে বিরাট রেশনের হোলসেল স্টকিস্ট, মস্ত কাপড়ের দোকান—তেলকল—আটা কল বসিয়েছে।

মতিবাবুদের অবস্থাই পড়ে গেছে তার তুলনায়।

মতিবাবু তবু কোনমতে টিকে আছে, বড় বড় বাড়িগুলো মেরামত অভাবে ধ্বসে পড়ছে। দেওয়ালে বটগাছ শিকড় গেড়েছে। আর রবি সরাওগীর বাড়ির পরিসর বেড়েছে। দুতলা ছাড়িয়ে তিনতলা উঠেছে।

রবি সরাওগী টাকা করেছে এখানে। এখন সে চায় প্রতিপত্তি। মেলা কমিটিতে তাকে ডাকা হয়েছে নামের জন্য, কিন্তু দেখেছে রবি সরাওগী, সব কাজকর্ম করছে খোকন মিত্তিরই ওই মতিবাবুর হয়ে।

কলকাঠি নাড়ে সবকিছুর ওই মতিবাবুই।

রবি সরাওগীর কোন কথাই সেখানে চলে না। এইটা নিয়ে বেশী তড়পায় ওই বাদল ডাক্তার আর পতিতবাবু। পতিতবাবু ইস্কুলের মাস্টার।

সে আর বাদল ডাক্তার চিনেছে আগামী দিনে এখানের সব কর্তৃত্ব তুলে নেবে রবি সরাওগী। তাই বাদল এখন থেকেই ওকে মেনে চলে।

রবি সরাওগীকে বলে বাদল।

—দেখছেন তো, ঈশ্বর বিপদে আপদে আপনার হয়ে খাটে। মেলায় তাকে ছক পাততে দিত না খোকন মিত্তির। জুয়ার ছক পাততে দিত তার চ্যালা নন্দকে। আমরা জোর করে ঈশ্বরকে ছক পাততে দিলাম, তাই নিয়ে কত রাগারাগি! খোকনটা এন নম্বর বদমাশ।

রবি সরাওগী এর মধ্যে রাতের কারবারও শুরু করেছে। মালপত্র জেলা বর্ডার পার করে দুনো দামে বেচে সে। এ কাজে ঈশ্বরের মত লোকদের দরকার হয়।

বেপরোয়া ওরা। মাঝে মাঝে ডাকাতির ব্যাপারে পুলিশ ওদের খোঁজখবর নেয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সেই খোঁজখবর নেবার ব্যাপারটা বেশীদূর অবধি গড়ায় না। চাপা পড়ে যায়।

অনেকে বলে—ওসবে নাকি রবি সরাওগীরও হাত আছে।

তবু রবি ওদের দেখে। তাই ঈশ্বরকে এটা দিয়েছে। কিন্তু খোকন মতিবাবু যে খুশি হয়নি তা জানে রবি। রবি সরাওগী এর জবাব ঠিক সময়ে দেবে! তবু রবি বলে—যেতে দাও বাদল। পতিতবাবুও আছেন। ভালোয় ভালোয় মেলার কাজ চুকে যেতে দিন।

বাদল বলে—নামেই আমি নাকি সেক্রেটারী, যা করার ওই চোর খোকন মিত্তিরই করছে। হিসাবও নাই তার। তাই বলছি সরাওগীবাবু সামনে বার মেলায় প্রেসিডেন্ট হবেন আপনিই।

রবি মনে মনে খুশী হয়।

পতিত মাস্টারও সায় দেয়—হ্যাঁ। আমিও সেই চেষ্টাই করবো।

রবি সরাওগী দেখেছে মেলায় আমদানিও ভালো হয়।

আর মান খাতিরও করে সবাই। তাই তাকে ওই পদটা পেতে হবে। বাদলকে তবু বলে সে।

—তোমরা জোর করলে না বলতে পারবো না। লেকিন আভি গোলমাল না করে কাজটা চুকিয়ে নাও। শুন্‌লো—ডি-এম সাহেব আসবেন প্রাইজ দিতে।

বাদল—হ্যাঁ! নিদেন সেই সভায় আপনাকে প্রেসিডেন্ট করবোই।

হাসছে রবি সরাওগী।

তার মনের অতলে এবার নোতুন কি পাবার ক্ষুধাটা জাগিয়ে তুলছে ওরা।

মেলার সব ব্যাপারে সেও এবার নাক গলাতে চায়। তার কারবার পুরোদমে চলছে। সে এবার এদিকের সব প্রতিষ্ঠার স্বাদ পেতে চায়। মতিবাবুদের হঠিয়ে দিতে হবে এই সম্মান, প্রতিষ্ঠার আসন থেকে।

খোকন মিত্তির শকুনের চোখ মেলে দেখছে মেলার সবকিছু! ঝুমরিতলা জমজমাট। হেমন্তের দল এসে গেছে, আর দু-দল ঝুমরী এসেছে। ওদিকে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। সিনেমাও চলবে এবার।

খবরটা আনে খোকন মিত্তির মেলার সব কম্‌প্লিট। সৃষ্টিধরের পুতুলনাচও এসে গেছে। দীঘির দক্ষিণ পাড়ে এগজিবিশন প্যাণ্ডেলের ওদিকেই জায়গা দিলাম গো!

মতিবাবু নিশ্চিন্ত হন—এসেছে তাহলে! ওর আবার টাউনে—যায় কলক।তায় খেপ থাকে। নামী লোক রে!

রবি সরাওগী একটু অবাক হয়—হ্যাঁ! স্রেফ পুতুল-নাচিয়ের এত দাম মতিবাবু? তাজ্জব!

সৃষ্টিধর বিকালে বের হয়েছে মেলায়। বিরাট দীঘিটাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে চারপাশের বাগানে, ওদিকে সবুজ মাঠে গম-ছোলার

চাষ, বিন্দু বিন্দু বেগুনী সাদা বিন্দুর মত ফুটে আছে ফুলগুলো।

আমগাছে এসেছে হলুদ মুকুলের ভিড়, গুনগুন সুর ওঠে। আনমনে সৃষ্টিধর মেলার এদিকে এসে পড়েছে। ঝিলের ধারে অতীতে জমিদারবাবুদের কুঞ্জ ভবনের বাঁধানো ঘাটটা আজ ভেঙে পড়ছে। মতিবাবুদের বিলাস কুঞ্জের কিছুটা টিকে আছে মাত্র এখানে এইভাবে। আর ওখানে নাচের মুশায়েরাও হয় না।

বাড়িটা তবু মেলার ক'দিন একটু ব্যবহারে লাগে। কয়েকটা চাঁপাগাছ এখন আপন খেয়ালে বেড়ে উঠেছে। ওদের ফুল ফোটে, আপনা থেকেই ঝরে যায়।

বাসিনীরাও এসেছে এ মেলায়। হঠাৎ বাসিনী সৃষ্টিধরকে দেখে এগিয়ে যায়—ওস্তাদ গো!

চমকে ওঠে সৃষ্টিধর—তুমি!

বাসিনী বলে—যাক, কত ভাগ্যি আমার চিনেছো তাহলে, কতদিন পর দেখা। এখন তো তোমার ঢের নাম-যশ গো! তারপর ভালো তো? কবে এলে?

সৃষ্টিধর বলে—আজই! তোমাদের খবর?

হেসে ওঠে বাসিনী—ব্যাঙের সর্দি হয় না মাস্টার! একেবারেই ফট হয়ে যায়। আমাদের মরণ হলে জ্বালা পুইবে কে?

বাসিনী ঘাটের ভাঙা চাতালে বসে পড়ে বলে—বসো, দাঁড়িয়ে রইলে যে! না, বসলেও দোষ?

সৃষ্টিধর বলে—না, না।

বাসিনী বলে—তাড়া যখন নাই একটুন বসো। বুঝলে মাস্টার, মন খুলে কথা বলারও কেউ নাই। ওই নরকের মাঝেই বাস করছি। আর রাতের আঁধারে সব জানোয়ার হয়ে ওঠে!

বাসিনীর কাছে সৃষ্টিধর যেন অন্য জগতের খবরই এনেছে, বদ্ধ জীবনে এনেছে মুক্তির স্বপ্ন-স্বাদ। সৃষ্টিধর চুপ করে শুনছে ওর কথাগুলো।

বাসিনী চকিতের জন্ম মনের ওই বেদনাটা ঝেড়ে ফেলে সহজ সুরে বলে।

—নিজের কথাই বলছি, তা নোতুন কি পালা বাঁধলে মাস্টার, শুনছি জিন ভূত নিয়ে কি দারুণ পালা করেছো। শহরে বিজায় নাম-ডাক হয়েছে। কলকাতায় গেইছিলা খেলা দেখাতে।

স্বস্তিধর একটু অবাক হয়, মেয়েটা সব খবরই রাখে! তাই বলে সে-এসব কোথায় শুনলে?

হাসছে বাসিনী।

—হাওয়ায় ওড়ে গো। তাছাড়া তোমার খবর জানতে মন কেমন করে মাস্টার। আরও নাম-যশ হোক তোমার। পথে-পথে ঘুরি দেহ বেসাতি করি, তাই বলে মনটাকে তো শেষ করতে পারিনি।

ওই হ্যাখ ঘাটের মড়া এসে জুটেছে! মরণ!

খোকন মিত্তির বাসিনীকে দেখে এখানে এসেছে। ওকেই দরকার তার।

মতিবাবুর পুরানো নাচঘরে আজ নাচের আসর বসাবে সে। তার জন্যই এসেছে বাসিনীর কাছে।

মতিবাবুর মাঝে মাঝে এখনও এসব খেয়াল হয়।

খোকন মিত্তির একগাল হেসে এগিয়ে আসে—বাসিনী! তোকে কত খুঁজছি।

বাসিনী চাইল ওর দিকে। খোকন পাকানো চেহারা নিয়ে এগিয়ে এসে স্বস্তিধরকে দেখে থামলো।

বাসিনীও বুঝেছে সেটা। তাই ইচ্ছে করেই বলে।

—নাগর যে। তা কি খবর গো। এলাম···দেখা নাই! দুটো কথাও বললো না। খুঁজে খুঁজে এই বাগানের একান্তায় এসে হাজির হয়েছো? তা বলো···চুপ মেরে গেল যে! বাক্যি হরে গেল নাকি!

খোকন বলে—এখন তুই কথা বলছিস পরে বলবো। তা মাসীকে কথাটা জানাতে মাসী বললে—তোমাকে জানাতে।

বাসিনী চোখে ঝিলিক তুলে বলে।

—তা মাইরী গোপন কথাটা কি বলো না? আমাকে বিয়ে করবে নাকি? এত লজ্জা কিসের গো? বলো?

খোকন মিত্তির জিব কেটে বলে—কি যে বলিস? মানে আমি নই—মতিবাবু বললেন আজ রাতে একটু খাওয়া-দাওয়া হবে, নাচগান হবে, ওর নাচঘরে।

বাসিনী বলে ওঠে—মুজরো লাগবে পঞ্চাশ টাকা, মাসীর খর্চা বাদ, বুঝলে নাগর। মাগনায় ছেলেমেয়ের নাচ দেখা যায় না! কি রাজী হবে তোমার বাবু?

—ওসব ঠিক আছে। যাই তালে খপরটা দিই গে। আবার সব ব্যবস্থা করতে হবে, মাংস-টাংস ইয়ে টিয়ে চাই—তাহলে চলি বাসিনী।

খোকন মিত্তির বেশ রেগে চলে যেতে বাসিনী এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে।

—দেখলা মাস্টার ভদ্দর লোকদের ব্যাপার। তাই বলছি গো, যেদিকে চোখ চাইলাম মানুষ দেখতে পেলাম না। তুমি তো বিধেতে-পুরুষ। পুতুল নাচাও, আমাকে কোন বিধেতে পুরুষ নাচায় বলতে পারো, দেখা হলে সে ভগমানের মুয়ে নুড়ো জ্বেলে দিতাম।

রাত্রি নামছে।

স্বস্তিধর বলে—চলি বাসিনী।

ঈশ্বর এই এলাকার নাম করা একটি তরুণ। সতেজ শালগাছের মত ঋজু চেহারা, গায়ে বাড়তি মেদ এতটুকু নেই, ওর মনে ও কোন দুর্বলতার লেশ মাত্র নেই।

ওর বাবা ছিল এদিগরের নামী জুয়াড়ী।

জুয়া খেলার সব কৌশল ছিল তার নখদর্পণে। ঈশ্বরের বাবার ওই গুণটা তো পেয়েছেই ঈশ্বর, এ ছাড়াও ঈশ্বর আরও অনেক সদ্‌গুণ নিজের সাধনায় অর্জন করেছে।

লাঠি-সড়কিতে সে ওস্তাদ।

নিজের আখড়ায় ওটার রীতিমত চর্চা করে, হু'চার জন বংশবদ সাগরেদও আছে। লোকে বলে—ওটা নাকি ডাকাতির মহড়া করার আড্ডা।

অবশ্য ধরাছোঁয়ায় থাকে না ঈশ্বর।

আর ওই জুয়ার ছক, ওতে ঈশ্বরের ঘুঁটি নাকি কথা বলে। কথা শোনে। ঈশ্বর বসে বসে দান ফেলতে পারে।

ঈশ্বরের বাড়িতে রয়েছে এক পিসী। বুড়ি দেখেছে তার ভাই ঈশ্বরের বাবাকেও রাতের বেলায় মেলায় মেলায় ঘুরতে, ছক নিয়ে। জুয়োর ছক না পাততে পারলে ওদের যেন ঘুম হয় না।

কতো নিষেধ করেছে। কান্নাকাটি করেছে। তখন ঈশ্বরের মা বেঁচে, মেয়েটাও ঈশ্বরের বাবাকে ফেরাবার চেষ্টা করেছিল ওই পথ থেকে।

কিন্তু রাতের অন্ধকারে লোকটা যেন মেতে ওঠে। সে বের হয়ে যায় ছক নিয়ে।

বউ মারা যায় সেই রাত্রেও বের হয়েছিল ঈশ্বরের বাবা। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, সংসার কোন কিছুর উপরই তাদের টান নেই।

...পিসীই ঈশ্বরকে মানুষ করেছে তারপর থেকে। দিনরাত চীৎকার করে দাদার উদ্দেশ্যে।

—মরবে ওই পাপের নেশায়।

ছেলেটাকেও তবু নিয়ে বসে ঈশ্বরের বাবা। পিসী চমকে ওঠে —ইকি করছিস দাদা! নিজের পরকাল খেয়েছিস আবার ছেলেটাকেও শেষ করবি?

হাসে ঈশ্বরের বাবা। বোনের কথায় বলে।

—বনেদী ঘরের এই বন্দেজ রে! আমার বাবার মন্ত্রপূত ঘুঁটি. ছক। এতেই সব। আমার কাল তো শেষ হয়ে আসছে, যোগ্য ছেলেকে শেখাবো না?

ঈশ্বরকে নিয়ে বসেছে তার বাবা। সামনে অয়েলক্লথে ছবি আঁকা ঘরগুলো। আর হাতে চামড়ার মুখখোলা ডিবেয় হাড়ের ঘুঁটি। তাতে রুইতন-হরতন এর ছবি আঁকা!

—নাড়—নাড় ব্যাটা। নাড়তে নাড়তে ঘুঁটির ডিবে কানের কাছে আন্! এক একদিকের এক এক রকম বাজি।

যখন তার আসবে বাত্তির—তখন দান ফেলবি। ব্যস, মার কৈলাস্! ফেল—দান ফ্যাল। ভানুমতীর খেল—

হাসে ঈশ্বর।

ছোট ছেলেটার হাতে যেন এমনিই দান পড়ে। চীৎকার করে ঈশ্বরের বাবা ছেলের কৃতিত্বে—সাবাস বেটা!

পিসী গর্জে ওঠে—ছেলেকে লোকে পাঠশালে পাঠায়। পড়াশোনা করায়, তা নয় বসালো জুয়ার ঘুঁটি নাড়া শেখাতে! দোব সব টান্ মেরে নদীর জলে ফেলে!

হাসে ঈশ্বরের বাবা।

ছেলেটা যেন কি নেশায় মেতে ওঠে। আপনমনেই ঘুঁটি নাড়ে—ছকের এ ঘর, ও ঘরে ইচ্ছামত ঘুঁটি ফেলতে শিখে চলেছে।

পিসীও চীৎকার করে—মরবি অনামুখো—ওই নিশাতেই মরবি।

ঈশ্বর হাসে।

বাবা মারা যাবার পর ঈশ্বরের নাম-ডাকও বেড়েছে।

শুধুমাত্র জুয়ার ছক নিয়েই নয়, সে এখন বেশ গুছিয়ে দল করেছে। আর তাই নিয়েই বাজার পাড়ার নন্দ, ভজনদের সঙ্গে টক্করও বেধেছে কয়েকবার।

নন্থ এখন মতিবাবুর ওখানেই থাকে। এককালে মতিবাবুদের নাম-ডাক ছিল, তখন থেকেই নন্থ ওখানে। এখন সেই দলটি উঠে গেছে, নন্থ তবু রয়ে গেছে।

সেও বাজারে মস্তানি করে।

ঈশ্বরের সঙ্গেই বাধে এই নিয়ে। কি সেবার নন্থর দলকে ঈশ্বরের

দল মেরে হঠিয়ে দিয়েছিল বাজারে। রবি সরাওগীকে দখল পাইয়ে দিয়েছিল নোতুন জায়গাটা।

সেই থেকে রবি সরাওগী ঈশ্বরকে চিনেছিল। আর তার ভরসাতেই রবি সরাওগী আটা-চাল-তেল-এর কারবারে নেমেছে, জানে বর্ডার পার করাতে পারলে দিগুণ দাম পাবে, সেটা ঈশ্বরই করিয়ে দেয়।

নন্তুর দল জুৎ করতে পারছে না কোথাও। খোকন মিত্তির নন্তুর দলের বন্ধু লোক। তাই সেও চেয়েছিল মেলায় জুয়োর ডাক নন্তুকেই দিতে। কিন্তু তা পারেনি! ঈশ্বরই জেঁকে বসেছে।

মনে মনে চটলেও খোকন কিছু বলতে পারেনি।

ঈশ্বর জাঁকিয়ে বসেছে মেলায়। হৈ-চৈ পড়েছে তার আসর ঘিরে। এবার মেলায় লোকও জমেছে, দোকান-পশার বসেছে এদিক থেকে ওদিক অবধি। এবার ধান ভালো হয়েছে, তাই মেলাও জমেছে। কেনা-বেচা ভালোই হবে।

এদিকে আমতলায় আসব জাঁকিয়ে বসেছে ঈশ্বর। তার জুয়োর ছকের চারিদিকে ভিড় করেছে বহু মানুষ। চাষী—সাধারণ মানুষের ট্যাঁক থেকে পয়সা পড়ছে ছকে—সিকি আধুলি টাকা।

ঈশ্বরের গলা চড়ে মাঝে মাঝে।

—নসীবের খেল বাবু!

গুপী ওর সাগরেদ, লোকটার শীর্ণ গলা আরও একমাত্রায় চড়িয়ে চীৎকার করে চলেছে।

—নসীবের খেল বাবু, নসীবের খেল! এক গুণ দিলে তিন গুণ। যেখানে ইচ্ছে এড়ে দিন, রুইতন, হরতন, কাঁটা—জাহাজ যে কোন ঘরে ইচ্ছে। ধম্মের দান বাবু।

ঈশ্বরের গলা শোনা যায়। নামকরা জুয়াড়ী ঈশ্বর। আমতলায় আসর পেতে বসেছে সে। দুদিকে দুটো কারবাইডের লম্বা নলওয়ালা বাতি জ্বলছে। হাঁকছে ঈশ্বর।

—ধম্মের দান ! লাক টেরাই করেন বাবু !

ছ'টা মার্কাওয়ালা ঘর, চিড়িতন-রুইতন-ইস্কাবন-হরতন মধ্যে উপর নীচের ছুটো ঘরে মুকুট আর পতাকার ছাপ, এই ছটা ঘরের মধ্যে যত লেন-দেন, আর তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে বাটির মধ্যে ওই ঘুঁটি। ওখানেই যতো কায়দা কারসাজি। ঝপ ঝপ দান টাকা-আধুলি-পাঁচ টাকার নোট—মায় দশ টাকার নোট পড়ছে সব ঘরেই। ঈশ্বরের চোখ জ্বলছে।

অস্ফুট আর্তনাদ ওঠে সমবেত লোকজনের মধ্যে।

ঘুঁটি বাজছে চামড়ার কৌটায় খট-খট-খট—হাঁকছে ঈশ্বরের চেলা—লাক টেরাই।

চোট খেয়েও লোকজন যেন মরীয়া হয়ে ওঠে। দারুণ জমিয়েছে ঈশ্বর আজ জুয়ার ছক।

খোকন মিত্তির এক ফাঁকে মেলায় এদিকটাও ঘুরতে এসেছে, দূর থেকে একটা জামগাছের নীচে থেকে দেখছে ঈশ্বরের আমদানির বহরটা।

রবির অন্ধকারের কারবারের অন্যতম মাথা ওই ঈশ্বর। জুয়া আর মদ ছুটোরই ব্যাপারী সে। খোকন মিত্তির রাগে জ্বলছে। তার চ্যালা নন্তুরাম। ভেবেছিল খোকন মিত্তির নন্তুকেই এ মেলার ডাকটা পাইয়ে দিয়ে নিজেও বেশ কিছু লুটবে। কিন্তু তা হয় নি। কাছেই ছিল নন্তু, দেখে শুনে বলে।

—দারুণ টানছে গো ঈশ্বরে। আমার বরাত ফক্কা হয়ে গেল মিত্তির মশায়। আপনি তো ভাগ ঠিকই পাবেন। আমার কি হবে ?

খোকন মিত্তির জ্বলে উঠে চাপা রাগে।

—ছাই দেবে। ও ব্যাটার টিকি বাঁধা অন্য জায়গায়। ভেবেছে তারাই রক্ষে করবে। আমার নাম খোকন মিত্তির দেখে নোব ব্যাটাকে। ধাক্কা দিয়েছে আমাকেও।

নন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনে মনে খুশীই হয়। ও জানে আর

এক জুয়াড়ীকে কি করে জব্দ করতে হয়। আর তাই যদি করতে পারে খোকন মিত্তির, সেও বসে যাবে ছক নিয়ে। নন্থ কথাটা ভাবছে।

অবশ্য এখনও যে করছে না ওটা তা নয়, তবে ছক পেতে নয়। অন্য ভাবেই হঠাতে হবে ঈশ্বরকে।

ঈশ্বর পুরোনো বনেদী ঘরের খেলোয়াড়। ওর বাবা ভগবান ছিল এদিককার নামকরা জুয়াড়ী। ছক আর ঘুঁটি যেন তার হাতে কথা কইতো। সেবার বড় কর্তা স্বয়ং ওর খেলার হাত দেখে নিজের জুতোটাই এড়ে দেন ভগবানের জুয়ার ছকে।

সকলেই চমকে ওঠে, লক্ষ্মীর ছক, তাতে জুতো এড়ে দিলেন স্বয়ং জমিদার বাবু নিজে। নেহাৎ তিনি বলেই ঈশ্বরের বাপ ভগবান কিছু বলতে পারে না, চাইল মাত্র। তার যোগ্য সন্তান ঈশ্বর তখন কুড়ির জোয়ান, ক'বছর বাপের কাছে খেলা শিখেছে, সেও দেখেছে ওই জুতো আড়া, বড়বাবু যেন তার বাবাকে অপমান করার জন্যই জুতো দিয়েছেন ছকে। ছেলেটা দেখছে।

ভগবান রাগে অপমানে ফুঁসছে নীরবে। দর্শকরাও অবাক হয়। স্তব্ধতা নামে চারিপাশে। ভগবানও চুপ।

কিশোর ঈশ্বর বলে—বাবু জুতোটা দিলেন ছকে, ওটাতো ফিরে পাবেন না, তখন তো খালি পায়েই যেতে হবেক বড়বাবু, যদি জিতে যাই।

বড়বাবু চাইলেন ঈশ্বরের দিকে। বলেন।

—তুই ভগবানের ব্যাটা না? বেশ তো তৈরি হইছিস দেখছি, ঠিক আছে আর একপাটিও দিলাম অন্য ঘরে। পারিস তবে জিতে নে। আর না পারলে বাপধন ওই জুতো আর আস্ত রাখবো না। তোর পিঠে ছিঁড়ে খালি পায়েই মেলা থেকে যাবো। কি রে রাজি?

ঈশ্বরের আঙুলগুলো যেন মুখর হয়ে ওঠে। ঘাড় নাড়ে সে।

খড় খড় নাড়ছে ঘুঁটি, কান পেতে শুনছে ঈশ্বর, ওই নীরব ভাষা তার জানা। হাড় নয়—ও যেন কি আনন্দমুখর হয়ে ওঠে, হ্যাঁ, লগ্ন

এসেছে।

ঘুঁটি পড়েছে।

জাহাজ কাঁটার ঘর দুটো বাঁচিয়ে একেবারে অন্য ঘরে!

—সা-বাস বেটা! ভগবান হাঁক পাড়ে।

জনতার মধ্যে অস্ফুট আর্তনাদ ওঠে। দান কুড়িয়ে নেয় ভগবান। মোটা টাকার দান। সেই নোতুন জুতো জোড়াও হাতে নিয়ে বলে।

—মাপ করবেন হুজুর! এ জুতো নিলাম তাহলে—

হাসছেন বড়বাবু—তাই ত রে! ব্যাটাকে জব্বর তৈরি করেছিস! ঠিক আছে নে—মিষ্টি খাবি। বাজিতে হেরে গেছি জরিমানা তো দিতেই হবে।

ঈশ্বরের হাতের খেলা দেখে ভগবানও অবাক হয়। বাবা ভগবান গত হয়েছে, এখন ঈশ্বরেরই দিন চলছে।

ঈশ্বরের চ্যালা ভজন দান সাজাতে সাজাতে গলা নামিয়ে বলে।

—খোকন মিত্তিরকে দেখলাম গ নন্তুর সঙ্গে। এদিকে থির হয়ে চেয়ে দেখছিল। কি মতলব ওদের কে জানে?

ঈশ্বর বলে—ছাড় তো! হাত ফসকে গেছে তাই আপসাচ্ছে নন্তু। ডাক—দান ডাক। অরে গুপীকে একবার দেখতে বলে দে নন্তু কি করছে দেখে আসবে।

ভজন গলা চড়িয়ে হাঁকতে থাকে—লাক টেরাই। জাহাজ, কাটা, রুইতন সব ঘরেই সমান। আসুন।

খোকন মিত্তিরের বশংবদ নন্তু সোজাসুজি মেলায় বসার অধিকার পায়নি। তবু সেও জুয়াড়ীই। চুপ করে থাকতে পারেনি। তবু নন্তু অবশ্য এর মধ্যে এক কোণে তাস নিয়ে বসেছে। তার পুঁজি তিনখানা তাস মাত্র। তিনখানা তাস বাতাসে যেন ভেসে ভেসে মাটিতে পড়ছে উপুড় হয়ে। নম্বর বের করতে পারলে ডবল টাকা।

ধরা পড়লে মুশকিল হবে। মেলার কত্তারা ছাড়বে না। আর পুলিশও ধেয়ে আসবে। সর্বস্ব চলে যাবে নন্তুর।

নন্টুরও দান বেশ ভালোই পড়েছে। খোকন মিত্তিরকে কিছু দিতে হবে মাত্র, বাকী সবই তার। নিদেন টাকা বিশেক টেনেছে, আরও হবে। নন্টু খেলছে তিন তাস।

হঠাৎ গুপীকে এসে খপ্ করে ওর হাত ধরতে দেখে চমকে ওঠে। গুপীও চালু মাল। জুয়াড়ীর সাগরেদ।

গুপী বলে—কি হচ্ছে এসব? ওদিকে জুয়ার ডাকের পয়সা দিচ্ছি আর তুই খ্যাপলা মারবি! চল শালা নদো।

নন্টুরাম মুঠোবন্দী টাকা যা পেয়েছে তুলে নিয়ে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে দৌড় মারার চেষ্টা করে। এবার অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে নন্টুর উপর। তারাও গর্জায়।

—শালা টাকা লিয়ে পালাবা? মার শালাকে!

নন্টু ভাবেনি এভাবে ওরাই তাকে ধোলাই দেবে। গুপী অবশ্য আর দাঁড়ায়নি।

এই গোলমালে নন্টু যখন জনতার হাতে আদর খাচ্ছে সেও কেটে পড়েছে মাল-কড়ি যা হাতে পেয়েছে তাই নিয়েই।

নন্টু অবশ্য একা ছিল না। হারু, ঘোতন ওরাও এসে পড়ে ওকে ছাড়াবার জন্যে, তার আগেই নন্টুর সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে।

নন্টুরও দলবল কিছু আছে। তারা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ওরা কেউ ভাবেনি যে ঈশ্বরের সাকরেদরা মেলায় ঘুরে-ফিরে নন্টুকেও এই অবস্থায় ধরে ফেলবে। আইনতঃ নন্টুর জুয়ো খেলার কোন অধিকারই নেই, এখন ধরা পড়ে মার খেয়েই সরে আসতে হয়েছে নন্টুকে।

গোপীনাথ আরও দু একজন নন্টুকে মারধোর করেই ক্ষ্যান্ত হয় নি, তার সব টাকা পয়সাও কেড়ে-কুড়ে নিয়ে চলে গেছে।

ততক্ষণে নন্টুর সহচররাও এসে পড়েছে।

কিন্তু করার কিছু নেই। ওরা সরে গেছে।

নন্টুর দলের হার ঘোতনরা দেখেছে ব্যাপারটা। ঘোতন বলে—

শালা ঈশ্বরে লুটপাট করবে? এতবড় তাগদ ওর? বলো নন্তুদা আমরাও শালার ঢাক ফাঁসিয়ে দিই। মেলা তুলে দেব বোম্ মেরে!

নন্তু জানে এতে গোলমাল বাড়বে।

আর এ ব্যাপারটায় খোকন মিত্তিরকে না জানিয়ে কিছু করা ঠিক হবে না। সেও চুপ করে সইবে না।

কিন্তু তার আগে খোকন মিত্তিরের অনুমতি একটু নেওয়া দরকার। নন্তু বলে—একবার মিত্তিরকে বলি!

ঘোতন খুশী হয় না।

জানে এখন ঈশ্বরের হাতে মোটা টাকা রয়েছে, কেড়ে নিতে পারলে ভালোই আমদানি হবে। কিন্তু তাতে রাজী নয় নন্তু।

ঘোতন বলে—করো যা ভালো বোঝো। তবে বাপু আমার কথা যদি নাও তাহলে বলো—দেখিয়ে দিই ওদের!

নন্তু বলে—ও সব পরে ভাববি ঘোতন। একবার দেখে আসি, মিত্তিরকে।

মেলার আলো ঝলমল করে। এদিকে মনোহারী পটি, ওদিকে বাসনপটি—ওপাশে দরজা জানলা—গরুর গাড়ির চাকা সব বিক্রি হচ্ছে। মানুষের দরকারী জিনিস, খাবার জিনিস ছাড়াও আছে মনমাতানোর নানা আয়োজন।

কবি গানের আসর বসেছে। একটু বেশী রাতে যাত্রা শুরু হবে। এখন থেকেই দর্শকরা জায়গা দখল করে বসেছে। ওদিকে চলেছে ঝুমুরের নাচ-গান।

মেলা কমিটির অপিস আজ একটু ফাঁকা! কারণটা অন্য।

রবি সরাওগীরও নেমন্তন্ন হয়েছে। নেমন্তন্ন হয়েছে বাদল ঘোষ, পতিতবাবু, আরও অনেকের। পতিত মাস্টার জানে মতিবাবুর ওই বাগান-বাড়িতে নাচের আসর বসবে।

পতিত বলে—ওহে বাদল! আমি বাপু ওসবে নাই! ওই সব অখাদ্য টখাদ্য খেতে আর বলো না।

বাদল বলে—ঠিক আছে। তবে আপনি আর বদনবাবু দুজনে কিন্তু বলে রাখবেন, যেন ওই প্রাইজ দেবার মিটিংএ রবিবাবুকেই প্রেসিডেন্ট করা হয়।

রবি সরাওগীও সেজেগুজে এসেছে।

বাদল ওকে দেখে বলে—তাহলে যাবেন রবিবাবু?

রবি সরাওগী বলে—বললেন উনি, একবার ঘুরে আসি। শুনলাম ভালো নাচিয়ে এনেছেন।

বাদল ঘোষ দেখছে লোকটাকে। ওর মনের অতলের খিদের খবর সেও জানে। ইদানীং রবি সরাওগীর সবদিকেই নজর পড়েছে। বাদল এতে মনে মনে খুশীই হয়। বলে সে রবিকে

—আপনার বাগান-বাড়িতেও একদিন নাচগান করিয়ে দিই। ওদেরও নেমন্তন্ন করে দেখিয়ে দেন। আপনিই বা কমতি কিসে?

রবি সরাওগী চুপ করে কি ভাবছে।

রাত্রি হয়ে গেছে।

বাদল আর রবি সরাওগী চলেছে মতিবাবুর বাগান-বাড়ির দিকে। বাইরে মেলার রোশনী জ্বলে, হৈ চৈ চলেছে।

সার্কাসের তাঁবুর বাইরে তখন বহু মানুষ লাইন দিয়েছে। মেলার এও এক অন্যতম আকর্ষণ। জেনারেটারের শব্দ ওঠে, গুরু গুরু শব্দ। রোশনী জ্বলছে। মাইকে চীৎকার শোনা যায়।

তাঁবুর ভিতর তখন পুরোদমে খেলা চলেছে। বাইরে থেকে আলোর আভা দেখা যায়। শোনা যায় বাজনার সুর। বাইরে লাইন দিয়ে টিকিট বিক্রি হচ্ছে কাউণ্টারে পরের 'শো' এর জন্য।

লোকজন মেলার স্বপ্নে যেন হারিয়ে গেছে।

—গিলি গিলি—পো!

এ দলের ক্লাউন নাথন সার্কাসের তাঁবুতে তখন তার চেয়ে দু-সাইজ বড় ঢোল্লা-প্যাণ্ট গোবদা একটা কোট পরে, দড়ির টাই গলায়

ঝুলিয়ে হাতে ছড়ি নিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের ভঙ্গিতে হাঁটছে—মুখে সাদা পাউডারের প্রলেপ, দুটো চোখ লাল কালো কালি দিয়ে আঁকা।

নাথন পাক্কা খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে একটা সাইকেলে চাপবার চেষ্টা করে হাত-পা ছেড়ে ধপাস করে পড়েছে। কে একজন ওর পেছনে একটা লাথি মারার ভঙ্গী করতে বিকট স্বরে চীৎকার করে ওঠে ক্লাউন সাজা নাথন!

—গিলি গিলি পো!

সারা সার্কাসের তাঁবু ভেঙে পড়ে হাসিতে।

ওদিকে জুলি অন্য মেয়েদের নিয়ে সাইকেলের খেলা দেখাচ্ছে। সাইকেলের একচাকার উপর ভর দিয়ে তন্বী সুঠাম মেয়েটি একটি বিদ্যুতের উজ্জ্বল রেখার মত সার্কাসের এরিনায় ঘুরছে। চড়-চড় হাততালির শব্দ ওঠে। ওরা সাইকেল নিয়ে চলে গেল ভিতরে রঙ-বেরঙের পরীর মত হাওয়ায় ভেসে। ক্লাউন নাথন তখন বুক ফাটানো চীৎকার করে ওঠে—গিলি গিলি পো!

সেও তার বিচিত্র পোশাক নিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে যেন ওই উড়ন্ত পরীর ঝাঁকের পিছনে দৌড়লো—দৌড়তে গিয়ে ছিটকে পড়লো মাটিতে। উঠে আবার লটপট করে দৌড়লো।

হাততালির শব্দ ওঠে। হাসির সাড়া জাগে।

এ্যান্টনি ওদিকে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছিল। সার্কাসে তার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, সে সবকিছুই দেখাশোনা করে। রিংএর খেলা চালানোর ভার তার উপরই।

নাথনকে দেখেছে কিছুদিন বাড়াবাড়ি করতে। আজও এরিনায় খেলা দেখাবার সময় ইচ্ছে করেই জুলির সাইকেলে জোর সাইড পুশ করেছে। দর্শকরা সেটা বোঝেনি—কারণ বিপদ কিছু ঘটেনি, তাই এই ব্যাপারটাকেও সার্কাসের জোকারের হাসির ব্যাপার বলেই হেসেছিল।

জুলি ভিতরে ফিরে রাগে ফুঁসছে, আজ চরম কেলেঙ্কারি হতো খেলা দেখাতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়া নিজের কাছে, দলের পক্ষেও চরম অপমানের।

নাথন এর আগেও এমন কাণ্ড করেছে। সেবার সিউড়ির বড়গাঁয়ের মেলায় ট্রাপিজের খেলা দেখাবার সময়ও তেমনি ইচ্ছে করেই রিংটা সরিয়ে নিয়েছিল উপরে। শূন্যপথে দেহ ভাসিয়ে আসছে জুলি। সামনের রিংটা ধরবে।

কিন্তু রিংটা তখন নাথনের হাতে, সে ইচ্ছে করেই সেটা ধরে বাঁদরের মত দুলে লোক হাসাবার চেষ্টা করছে। প্রায় চল্লিশ ফিট উপর থেকে জুলি ব্যাপারটা দেখে চমকে ওঠে, এবার ছিটকে পড়বে তার দেহটা শূন্য থেকে, মাঝপথেই সামার ভল্ট খেয়ে নীচে জালের উপর পড়ার জন্য দেহটা বাঁকিয়েছে—ঘামছে জুলি। রাগে অপমানে—ভয়ে সে কাঁপছে।

হঠাৎ বিপদ বুঝতে পেরে তারই সহকারী খেলুড়ে কুট্টি, সাইড রিংটা ঠেলে দেয় ওর দিকে। জুলি নেহাত ভাগ্যের জোরেই সেটা ধরে সামলে নিয়েছে।

নেমে এসে সেবার নাথনকে যা তা বলেছিল সে।

এ্যান্টনিও দেখেছে ব্যাপারটা। সে নাথনকে ভিতরে আসতে দেখে বাঁ হাতে ওকে ওই ক্লাউনের পোশাক সমেত উপরে তুলে গর্জে ওঠে।

—ঘাড় মটকে দেব! কেন করেছিলে ওই রকম, এখুনি অ্যাকসিডেণ্ট হতে পারতো?

নাথনও বুঝেছে ব্যাপারটা। আর কেন করেছিল সেটা নাথনও জানে।

দলের মালিক বুড়ো পেরেরা সাহেব জুলির বাবা। সেও ব্যাপারটা জানে। পুরোনো দল তার। আজ পেরেরার বয়েস হয়েছে। এত বড় সার্কাসের দল চালানোর সাধ্য তার নেই। নানারকম ঝামেলা।

এত বাঘ হাতি পোষা, আর ওই খেলোয়াড় নামক বিচিত্র জীবদের নিয়ে সার্কাস চালানোর সব ঝক্কি তুলে নিয়েছে এ্যান্টনি। ওর হাতে দল ঠিকঠাক চলছে।

আর এ্যান্টনির মস্ত বড় পরিচয় সে জন্তু-জানোয়ারদের ট্রেনিং দিতে ওস্তাদ।

এই এ্যান্টনিকেই ভালোবেসেছে জুলি। পেরেরার একমাত্র মেয়ে। নিজেও ভালো খেলা জানে।

পেরেরা এতে অখুশী হয়নি। আশা করে সে একদিন ওদের বিয়ে-থা দিয়ে এই সার্কাসের ভার তার হাতেই তুলে দেবে।

কিন্তু পেরেরা সাবধানী লোক। এ খবরটা কাউকে জানতে দেয়নি। ওদের দু'জনকেও না। বরং মাঝে মাঝে এ্যান্টনিকে বকাঝকা করে পেরেরা।

—তুম কুছ কামকা নেই। তুমকো ভি হঠায়েগা জরুর।

এ্যান্টনি চুপ করে থাকে ওই বকুনি খেয়েও।

পেরেরাও জানে ওর চুপ করে থাকার কারণটা। জুলিকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না। তাই ধমকে ওঠে পেরেরা—যাও, ঠিক সে কাম দেখো। তনখা নেহি মিলতা?

এ্যান্টনি চুপ করে সরে আসে।

জুলিও দেখছে ব্যাপারটা। এ্যান্টনি মাঝে মাঝে জুলিকে বলে—সুইটি! আমি চলে যাবো।

—স্টপ ননসেন্স, তুমকো যানে নেহি দেগা! ড্যাডিকো বোলনে দেও। তুম আপনা কাম দেখো ডিয়ার।

জুলির বাঁধনেই বাঁধা পড়ে গেছে ন্যাথেনিয়াল এ্যান্টনি, রিং-মাস্টার। ওরা দুজনেই দুজনকে কেন্দ্র করে কি স্বপ্ন দেখে।

আর একজন রাগে জ্বলে ওঠে, সে ওই ক্লাউন নাথন। তার অনেক স্বপ্ন ওই জুলিকে ঘিরে। তাই পেরেরা সাহেবকে সেই-ই খবরটা দেয়। গোপনে।

—স্যার, জুলিকে ভি দেখি এ্যাণ্টনির তাঁবুতে! দু'জনে কিসব কথা বলে রাতের অন্ধকারে।

পেরেরা দেখছে নাথনকে।

লোকটা ভালো ক্লাউন। দারুণ হাসায় রিং-এ। কিন্তু ওকে এখন যেন একটা চোট-খাওয়া ভালুকের মতো দেখাচ্ছে। পেরেরা যেন মজা দেখছে। হঠাৎ চটে ওঠার ভান করে বলে।

—ইজ ইট সো! উ ননসেন্স এ্যাণ্টনিকো হম ভাগা দেগা। আই স্যাল কিক্ হিম আউট। কল জুলি!

নাথন খুশি মনে বের হয়ে এসে জুলিকে সামনে দেখে বলে—জুলি মাই ডিয়ার!

মালিকের গর্জনের কথা ভুলে যায় সে। নাথন এখন নিজের কথাই ভাবছে। ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে জুলির হাতটাকে টেনে নেবার চেষ্টা করে বলে।

—আই লাভ ইউ জুলি। তুমকো বহুৎ প্যার করে।

—তাই নাকি! হাসছে জুলি!

ক্লাউন নাথন এগিয়ে এসে ওর গায়ে যেন গা মিলিয়ে একটু স্পর্শ পেতে চায়।

—জুলি, তুমি আমার দিকে চেয়েও দেখো না ডিয়ার!

হাসছে জুলি। বলে সে।

এই তো দেখছি! চলো—কাজ আছে এখন যাই। পরে আবার দেখবো! এইটুকু মানুষ তো তাই সব সময় দেখতেই পাই না! প্লিজ!

হেসে চলে গেল জুলি। নাথন ওর কথার ঝালটা হজম করে চুপ করে। হঠাৎ মনে পড়ে তার পেরেরা সাহেব যে জুলিকে ডেকেছে সেটা বলা হয়নি। দৌড়ে এসে বলে—জুলি, বড় সাহেব ডাকছে তোমাকে।

জুলিও বুঝেছে ওই নাথনই কিছু লাগিয়েছে তার নামে বাবার কাছে।

তাই বলে সে—সে আমি বুঝবো। তুমি যাও নিজের চরকায় তেল দাও গে।

জুলি জানে ওই বেঁটে লোকটা সেদিন ইচ্ছে করেই ট্রাপিজের খেলায় তাকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল। আজও সাইকেলের খেলার সময় ইচ্ছে করেই ধাক্কা দিয়েছিল।

জুলি ভিতরে গিয়ে নাথনকে দেখে রুখে দাঁড়ালো ফণা তোলা সাপের মতো। নাথনও বুঝেছে ব্যাপারটা, জুলি সামনে দাঁড়িয়ে বলে—কি করছিলি ইডিয়ট ?

নাথন হাসছে, জুলি চটে ওঠে।

নাথন বলে—রাগলে তোমাকে বহুৎ সুন্দর দেখায়। তাই একটু রাগিয়ে দিলাম মাইরী জুলি—

জুলিও রাগে অপমানে ওই লোকটার গালে সপাটে একটা চড় কষাতে নাথন রেগে উঠে ওর হাতটা ধরেছে, গজরাচ্ছে সে—আমাকে চড় মারবে ! এত সাহস—খতম করে দেব ! জুলিও ভয় পেয়ে গেছে।

হঠাৎ নাথন অনুভব করে তার দেহটা আর মাটিতে নেই, এ্যাণ্টনির শক্ত হাতের থাবাটা ওকে বাঘের মতো ধরে মাটিছাড়া করেছে। ছুটো ঠ্যাং নড়বড় করছে।

এ্যাণ্টনি ওকে শূন্যে তুলে গজরাচ্ছে—আই স্যাল ফিনিশ ইউ নাথন ! এর আগেও তুমি ট্রাপিজের খেলায় ওকে বিপদে ফেলেছিলে, আজও ব্যাপারটা আমি দেখেছি। খেলোয়াড় হয়ে একি স্বভাব তোমার ? জবাব দাও।

দু-চারজন খেলোয়াড়ও জমেছে। তাদের মুখে একই কথা—ওকে সামলাও এ্যাণ্টনি সাহেব, কোনদিন বিপদে ফেলবে আমাদের ?

এ্যাণ্টনি ওকে বেশ খানিকটা নাড়া দিয়ে চলেছে যেন হাড়গোড় খুলে দেবে। নাথনের মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে ভয়ে। ক্লাউনের বিচিত্র পোশাকে সে হাঁপাচ্ছে ! গর্জায় এ্যাণ্টনি।

—আজ ছেড়ে দিলাম, নেকস্‌ট কিছু দেখলে তোমাকে খতম করে

দেব। গো—

নাথন পালিয়ে বাঁচলো এখান থেকে।

জুলি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

বলে সে—এই নাথন যখন তখন বিরক্ত করে।

এ্যাণ্টনি শুনছে কথাটা। দেখেছেও সে। জুলি বলে।

রিপোর্ট করিনি, বেচারার চাকরি যাবে তাই।

এ্যাণ্টনি বলে ওঠে—ওকে দেখছি এবার, জুলি।

জুলি চুপ করে থাকে। এদিকটা নির্জন। বাগানের আম-জলপাই গাছ কয়েকটা জায়গাটাকে ছায়া-অন্ধকারে ভরে তুলেছে। জুলির চোখে জল। এ্যাণ্টনি ওকে কাছে টেনে নেয়।

—নো ফিয়ার, জুলি!

জুলি এ্যাণ্টনির বিরাট বুকে মাথা রেখে কি আশ্বাস পেতে চায়। তাদের এই যাযাবর জীবনের এই অবকাশেও প্রেম হয়, ঘরবাধাঁর স্বপ্ন আসে মনে।

…ঘণ্টা বাজছে।

একটা খেলা হয়ে গেছে। এবার অন্য খেলা।

তারপরই এ্যাণ্টনিওর বাঘ-সিংহ নিয়ে খেলা শুরু হবে। কয়েকটা বাঘ বাইরে এনে এ্যাণ্টনি খেলা দেখায়।

…এ্যাণ্টনি বলে, চলি জুলি।

জুলি চাইল ওর দিকে।

চেয়ে আছে রবি সরাওগী।

এইখানে এসে রবি সরাওগীও মদ ধরেছে। তবে সে দিকে রবি সরাওগী খুব হিসেবী। পরের পয়সাতেই ওটা বেশী খায়। নিজের পয়সার হিসেব তার আছে।

…মতিবাবুর ভাঙা নাচমহলকে খোকন মিত্তির একদিনে নোতুন

করে সাজিয়েছে। দেওয়ালের চুন বালি উঠে গেছে। সেখানে সাজিয়েছে ফুলের মালা, মেঝেতে পুরানো গালচে পাতা হয়েছে। ওদিকে তাকিয়া দেওয়া, বসেছে মতিবাবু।

এদিকে খোকন, রবি সরাওগী, ভূষণবাবু, ছোটতরফের কাশীনাথ-বাবু, বাদল ঘোষ আরও কিছু লোকজন আছে।

বাসিনী সেজেগুজে এসেছে। সঙ্গে এসেছে মোটা শরীর নিয়ে হেমন্তবালা। মুজরো বসেছে পুরোদস্তুর। সেজের আলোর শিষ কাঁপছে। ওই প্রকম্প আলোয় নেচে চলেছে বাসিনী, তবলায় বসেছে এ গ্রামের খুদু ওস্তাদ, তবলার বোল তুলেছে সে, বাসিনীও নিপুণ নাচিয়ের মতো খুদুর সেই বোলের জবাব রাখছে।

ফরাসে নাচছে বাসিনী উজ্জ্বল একটি বিন্দুর মতো। রবি সরাওগীর দু'চোখে নেশার আবেশ ; বাদল ঘোষ গ্লাস হাতে চাঙ্গা হয়ে দু'চোখ মেলে ওই মাংসল কামনামদির দেহের কাঁপনে কাঁপছে থর-থর। চীৎকার করে ওঠে।

—মাইরি বাসিনী, মরে যাবো রে !

ওর বিকট গলার চীৎকারে মতিবাবু চাইল বাদলের দিকে। এমন আসরে এই বিকট চীৎকার বেমানান।

বাদল ঘোষও ওই চাউনির সামনে একটু থেমে গেল। মনে মনে গজরায় বাদল ঘোষ, যেন একা ওর মেয়েছেলে ওই বাসিনী।

আর বাসিনীও দেখেছে ওদের চোখে এই হিংসার জ্বালা।

রবি সরাওগী ডাকছে ওকে—আও, ইধার আও। এই লেড়কি !

বাসিনী ইচ্ছে করেই এগিয়ে ওদিকে সরে গিয়ে মতিবাবুর সামনে বসে ভাও বাৎলে নাচছে, আর গানের সুর টানছে। ঠিক ঝুমুর নাচ-ও নয়, বাসিনী আজ অন্য ঢং-এ নাচছে। ভাও বাতলে বান্দজী ভাবে গান করে।

হেমন্তবালাও এসেছে। জনার্দন হারমোনিয়ামে ঠুংরীর চালে গৎ ধরেছে। ভাঙা আড়-খেমটার সুর।

মতিবাবু সাবাস দিয়ে ওঠে—বাহবা!

রবি সরাওগী রাগে ফুলছে। বাসিনী ওকে অগ্রাহ্য করছে।

খোকন মিত্তিরও দেখছে ব্যাপারটা। মদের দরাজ ফোয়ারা ছুটিয়েছে সে, দেখছে ওই বিচিত্র মানুষগুলোকে। ওদের মনের অতল থেকে বের হয়ে এসেছে প্রকৃত সেই রূপগুলো। আদিম আরণ্যক হিংস্র রূপ।

রবি সরাওগীর ছচোখে দেখেছে কি মত্ততার নেশা, বাদল ঘোষ ঘেয়ো কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করছে, আর মতিবাবুর খানদানী নীল রং-এ নারী মাংসের প্রতি সেই বংশগত নেশাটা যেন জেগে উঠেছে। মনে মনে হাসে খোকন মিত্তির।

—খা বাবা তোরা। খোকন মিত্তিরের কিছু আসুক। মদের ঘটা, খানা-দানা বাবদ তবু শ'দুয়েক টাকা তার হাতে থাকবে, ছুঁড়িটা নাচছে জব্বর। খোকন মিত্তিরের কাছে শুধু রক্ত-মাংসের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ও যেন বঁড়শিতে টোপ গেঁথে রাঘব বোয়ালদের সামনে নাচাচ্ছে, খপ করে কোনটা কখন বঁড়শি গিলবে কে জানে!

ওদের নিয়েই খোকন মিত্তিরের বেসাতি, সে ধসেপড়া জমিদার মতিবাবুই হোক আর ধূর্ত চোরাকারবারী ওই রবি সরাওগী হোক—তাতে তার কিছু যায় আসে না। খোকন মিত্তিরকে বাঁচতে হবে—তার জন্য যখন যেদিকে সুবিধা বুঝবে সে ভিড়ে যাবে। খোকন বলে।

—একটু দিই স্যার। এইটুন খেলেন যে!

রবি সরাওগী কুতকুত করে চাইল—দেগা? দেও।

খোকন মিত্তির আদর করে ওকে মদ গেলাচ্ছে, এদিকে মতিবাবুর খালি গ্লাসটা হাত থেকে নিয়ে অন্য একটা ভর্তি গ্লাস ধরিয়ে দিল মায়ের মতো মমতা ভরা হাত দিয়ে—খান কত্তাবাবু!

খোকন খুব ব্যস্ত! চরকির মত ঘুরছে।

—মিত্তির মশাই!

হঠাৎ ওদিকের অন্ধকার বারান্দা থেকে কার চাপা কণ্ঠের ডাক

শুনে চাইল খোকন মিস্তির।

এসময় এখানের এই রাসলীলা স্থলে কারো আসার হুকুম নেই তাঁর। তাই কাকে ডাকতে দেখে একটু বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গেল খোকন মিস্তির। ওসব ঝামেলা হঠাতে হবে।

একটা কাঁঠালী-চাঁপার ঘন ঝোপের পাশে কাকে দেখে চাইল। নন্থ এগিয়ে আসে।

খোকন মিস্তির শুধোয় কতো টাকা হল রে—দে দিকি নন্থ।

নন্থর মুখে পড়েছে একফালি আলো। কপালটা কাটা—রক্ত ঝরছে, জামাটা ছিঁড়ে গেছে।

নন্থ বলে—ওই ঈশ্বরের চ্যালা গুপী দলবল নে এসে মারধোর করে তাস-টাকা সব কেড়ে নিয়ে গেল মিস্তির মশাই। ছাখেন—মারধোর করে ক্যামন হাল করেছে।

খোকন মিস্তির চমকে ওঠে—তাই নাকি! এত বড় বাড় ওই ঈশ্বরের? এমনি করে মারবে তোকে?

নন্থ বলে—মেরে মাথা ফাটিয়ে দিত, বলে কেড়ে লিলুম তুর তাস-টাকা যা তুর বাপকে বল গা! কি করতে পারে করুক সে শালা!

খোকন মিস্তিরের উদ্দেশ্যেই যে ওই মন্তব্য করা হয়েছে তা খোকনও বুঝেছে, বলে সে।

—ঠিক আছে আমি এর বিহিত করছি, কাল সকালে দেখা করবি। যা, শোন!

ওর হাতে একটা ধেনোর বোতল আর কিছু কষা মাংস দিয়ে বলে—পরে আসবি কাল সকালে!

নন্থও মদের বোতল হাতে পেয়ে জোস ফিরে পায়। বলে সে—তাই আসবো মিস্তির মশাই, এর বিহিত করতেই হবে। আমিও চুপ করে থাকবো না।

অন্ধকারে খোকন মিস্তিরের চোখ জ্বলে ওঠে। ওদিকে কলরব চীৎকার উঠছে।

বাসিনী একটা নাচের পর একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। অন্য দুজন মেয়ে এবার আসরে নেমেছে। তারাও বেশ জমিয়ে তুলেছে যুগল নৃত্য দিয়ে।

বাদল ঘোষ কাছাখোলা অবস্থায় নাচার চেষ্টা করছে।

রবি সরাওগী চীৎকার করে—প্যারী বাসিনী নাচো—আউর নাচো প্যারী। জিতনা রুপেয়া লাগে হম্ দেগা।

মতিবাবুর শ্রীচরণের কাছে বসে বাসিনী তখন ঘাম মুছছে। বে-আব্রু শরীরের রেখাগুলো সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মতিবাবুর নেশা-জড়িত শ্লথ হাতখানা ওর পিঠে-কোমরে ঘুরছে, যেন ওই মাংসল স্পর্শে বুড়ো মতি রায়চৌধুরী কিসের সন্ধান করছে।

জড়িত কণ্ঠে চীৎকার করে মতিবাবু—এ্যাই খোকন—মদ? বাসিনীকে মদ দে। হেমন্ত খাও একটু। ভালো জিনিস।

খোকন মিত্তিরও তৈরি। বাসিনী জানে কোথায় পুজো দিতে হয়। মতিবাবুর গায়ে হেলান দিয়ে সে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। রবি সরাওগীর দিকে চেয়ে।

রবি সরাওগী দেখছে, তার মনে হয় সে'ও এবার মেলা কমিটিকে হাত করবে, চেয়ারম্যান হবে সামনের বছর। এখন থেকেই সে এগিয়ে যাবে, জানে মতিবাবুর কারবার চলছে লোকসানেই। ধান কলের মুনাফা লোটে ওই কর্মচারীরাই। রবিবাবুই ঋণ দিয়ে চলেছে তাকে।

মতিবাবুরও টাকার দরকার। রবি সরাওগী কিনে নেবে ওকে। তবু এই প্রাধান্য তাকে পেতেই হবে।

বাদল ঘোষ বলে— ছুঁড়িটা হারামী সরাওগীজী, এদিকে নজর নাই, ঢলাচ্ছে ওখানে? অপমান করবে আপনার?

সরাওগী ওকে থামায়—থামো বাদলবাবু, যানে দেও, নাচ দেখো আভি। পিছু দেখা যায়ে গা। কোন অজানা রহস্যে হারিয়ে গেল রবি।

আলিবাবা চলেছে গুপ্তগুহার সন্ধানে। মুগ্ধ জনতা—ছেলেমেয়ের দল—স্কুলের বেশ কিছু ছেলেমেয়ে তাদের কল্পনার জগতে হারিয়ে

গেছে। আলোর আভায় গুহাটা সরে যাচ্ছে—আলিবাবা ঢুকে পড়েছে সেই স্বর্ণ-ভাণ্ডারে।

পুতুলগুলো পর্দায় ছুটে আসছে ঘোড়ায় চেপে চল্লিশ জন ডাকাত। সর্দারের হাতের তরোয়াল ঘুরছে বনবন করে। অন্য ডাকাতরাও আসছে। দমবন্ধ করে দর্শকরা দেখছে সেই পুতুল রাজ্যের রূপকথার দৃশ্যগুলো। হাততালির শব্দ ওঠে।

সৃষ্টিধর এই জাদু নটের নায়ক। আজ সে নোতুন পালা শুরু করেছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছে সে ওই দর্শকদের। ছেলে-মেয়েদের আলো-আঁধার মুখ-চোখে কি মুগ্ধ বিস্ময়, সারা তাঁবু ভরে গেছে দর্শকের ভিড়ে।

শো হবার মুখে ঘোষণা করে—কালকের অভিনয় 'আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ'। জিন-দানোর বিচিত্র কাহিনী।

ছেলে-মেয়েরা কলরব করছে। বড়দের মুখেও তৃপ্তির ছাপ।

বলে নটবর—দারুণ জমিয়েছিস ছিষ্টি। কাল একটা শো দিতে হবে ইস্কুলের ছেলেদের জন্য! এই তো মাস্টারমশায়রা এসেছেন।

সৃষ্টিধর বিনীতভাবে নমস্কার করে, তখনও ক্লান্ত সে। কুণ্ঠিত স্বরে বলে—মানী লোক আপনাদের কোথায় যে বসাই, ওরে রাশু খানকয়েক চেয়ার-ফেয়ার দে!

হেডমাস্টারমশাইও এসেছেন। তিনি বলেন, থাক থাক।

—আপনার নাম শুনেছি, আজ অনুষ্ঠান দেখলাম। অপূর্ব করেছেন। গ্রামবাংলার একটা মৃতপ্রায় শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সৃষ্টিধর বলে—এই আমার গুরু, উনিই উৎসাহ দেন। নটবর সৃষ্টিধরের জন্য আজ গর্ববোধ করে। সৃষ্টিধর বলে—ঠিক আছে, কাল প্রথম শো-টা আপনার ছেলেদের জন্যই করবো। ওই শো-তে কোন টিকিট বিক্রি করবো না। আর পালা দেখাবো—আলাদিন! আর সেই সঙ্গে বাড়তি একটা ছোট্ট খেলা দেখাবো ছেলেদের—রবীন্দ্র-নাথের 'বীরপুরুষ'।

হেডমাস্টারমশায় খুশী হন, একজন পুতুল নাচিয়েও রবীন্দ্রনাথের নামই শোনেনি, তাঁর কবিতার উপর পুতুল নাচের পালা বেঁধেছেন শুনে অবাক হন! বলেন—রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন?

কপালে হাত ঠেকায় সৃষ্টিধর। বলে সে।

—সে ভাগ্য আর করেছি মাস্টারমশায়? মুখ্যু মানুষ—ওইটা আর দু'একটা কবিতা পড়েছি। তা গেলবার পৌষ মেলায় শান্তি-নিকেতনে 'বীরপুরুষ' দেখিয়েছিলাম ওখানের অনেককে। তাঁরা খুশী হয়েছিলেন—ওটাও ছেলেদের দেখাবো এখানে।

নটবর এভাবে কথা বলতে পারেনি। বুড়ো হয়েছে, হাঁপ ধরে। চোখেরও জোর নেই। নটবর তবু এই পুতুলের সংসারকে ছাড়তে পারে নি। রয়ে গেছে এইখানেই। শরীরটা ভালো নেই। তবু পড়ে আছে।

সৃষ্টিধর মাস্টারমশাইয়ের কাছে কালকের শো বাবদ আগাম টাকাটা নিয়ে বলে—তাহলে কাল আসুন। আপনাদের মতো গুণীজন আর ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিতে পারলে আমরাও খুশি হবো স্যর।

হেডমাস্টারমশাই বলেন—যা দেখি চারিদিকে তার তুলনায় এ সত্যিই অনেক ভালো। তাই স্কুল থেকে ছেলেদের এই অনুষ্ঠান দেখাতে চাইছি। এবার আরও কিছু ভাবুন—ধরুন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে কিছু।

ভাবছে সৃষ্টিধরও। বলে সে—এ সব নিয়ে আরও একটু ভালো করে কথা বলতে চাই বাবু। জানেন তো বিদ্যে আমার তেমন নেই। তবু আপনারা যদি পথ দেখান—কিছু করার চেষ্টা করবো। একদিন যাবো তা হলে আপনার কাছে। ঘটনাগুলো ভালো করে বলে দেবেন।

নটবর শুনছে ওর কথাগুলো। জ্বর রয়েছে গায়ে।

শীতে কাবু হয়ে যায় বুড়ো। তবু মনে হয় এখানে প্রাণ আছে। তাই এজগৎ থেকে সরে যেতে পারেনি।

রাত্রি নেমেছে।

সৃষ্টিধরকে বলে নটবর—কাজ করে যা ছিষ্টি, নোতুন ওইসব কাজ। লোক শিক্ষে দিবি, লোককে আনন্দ দিবি। শুদ্ধ আনন্দ রে।

বুড়ো নটবর একদিকে শুয়ে আছে। ও যেন একটা পুতুলই

সংসারের থেকে পালানো একটি মানুষ, কোন অদৃশ্য বিধাতার ইঙ্গিতে সে ঘুরে চলেছে, এদের নিয়ে সংসার পেতে এদের কাল্পনিক কোন জগতের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়েছে।

শীতে কাঁপছে নটবর!

সৃষ্টিধরের মায়া হয়, তাকেও সেই-ই আশ্রয় দিয়ে এই খ্যাতি এনে দিয়েছে। সৃষ্টিধর কম্বলটা নটবরের গায়ে চাপা দিতে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বলে সে—কত্তা, জ্বর। ডাক্তার ডাকবো?

নটবর চাইল, জ্বরে ধুঁকছে সে। বলে নটবর—তেমন কিছু নয় রে। আপনা হতেই চলে যাবেক। তুই শো—

নটবর চটের গাদার উপর পাশ ফিরে শুলো।

নটবর চুপ করে শুয়ে থাকে। সৃষ্টিধর ওর কপালে হাত বোলাচ্ছে। ওই তার একমাত্র আপনজন!

নটবর ওই স্পর্শটুকু অনুভব করে।

অতীতে নটবরও ছিল অমনি যুবক। সেদিন এই মেলার যাযাবর জীবনে সে এসে পড়েছিল কি এক দুর্বার আকর্ষণে। আর সেই আকর্ষণটা ছিল একটি মেয়েকে ঘিরে! সেই মুখখানাকে আজও ভোলেনি নটবর।

শ্যামলা মাজা-মাজা রং—ছিপছিপে গড়ন, ঝুমরির দলের নাচিয়ে মেয়েটি এসেছিল নটবরের জীবনে।

নটবর চেয়েছিল তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে। ঘর তার ছিল—জমি-

জিরেতও। কিন্তু মেয়েটি বলে—তা হয় না গো। আমাদের ঘর বাঁধা মানা।

গড়ানো পাথর—আমাদের গায়ে শেওলা বসতে মানা। নটবর চেয়ে থাকে ওর দিকে।

ছায়া নামা সন্ধ্যায় আকাশে তারার ফুল ফোটে, বাতাসে ওঠে বকুলের ক্লান্ত সুরভি। নটবর বলে—তালে।

হাসে মেয়েটি। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—আমাদের দাম কি বলো? তুমি ঘরের মানুষ—ঘরে ফিরে যাও। এ নেশা ভাল নয় গো।

কিন্তু নটবর ঘরের বাঁধন মেনেছিল, কিন্তু ঘরে ফেরে নি। মেলায় মেলায় ঘুরেছে ওই একজনের আশপাশেই। সেও পুতুল নাচের দল নিয়ে এ মেলা থেকে অন্য মেলায় যায় সেই মেয়েটির সন্ধানে।

দেখা হয়েছিল সেবারই নটবরের সেই মেয়েটির সঙ্গে বক্রেশ্বরের মেলায়। ওদিকে মূল মন্দির কুণ্ডের জলে তখনও যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়নি। বাইরের মাঠ জুড়ে মেলার সারবন্দী দোকান চলে গেছে মরা নদীর বালুখাত অবধি। কুণ্ডের জমা জলের ওপারের মাঠে গাছ-গাছালির বুকে মাথা তুলে আছে কোন সাধুর একটা ঝুপড়ি। ফিকে কুয়াশা উঠছে জলের বুক থেকে, ওই ভোর রাতে কাকে চান করতে দেখে সরে আসছে নটবর।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল।

—মাষ্টার! তুমি!

নটবর দেখছে সেই মেয়েটিকে। ভোর রাতে কুণ্ড থেকে চান সেরে উঠেছে, ভিজে কাপড়ে সারা দেহের যৌবন সোচ্চার—পরিস্ফুট, ডাগর চোখের তারায় কি খুশির ঝলক ফুটে ওঠে।

নটবরও চিনেছে তাকে, ওর জন্যই ঘুরছে সে মেলায় মেলায়। ঘরে মন টেকে না। ক'মাস পর তাই পথেই বের হয়ে পড়ে তার সন্ধানে পুতুলনাচের দল নিয়ে।

মেয়েটি এগিয়ে আসে ওকে দেখে।

মেয়েটি বলে—আবার মেলায় বেইরোছ তুমি, কেনে? ঘরে মনে রইল না?

হাসে নটবর—কেনে তাতো জানো তুমি?

মেয়েটি দেখছে ওকে। বলে সে!

—ধন্যি যা হোক! কি যে তুমি বুঝি না।

নটবর বলে—বুঝতে আমিও পারিনি। শুধু কাছে কাছে থাকবো—চোখের দেখা দেখেই খুশি হবো। এতেও তোমার রাগ?

মেয়েটি দপ করে জ্বলে ওঠে—

—তবু দেখার যদি কিছু থাকতো, সবই তো সেই পুতুল। কেউ কাঠের, কেউ রক্ত-মাংসের, এখনও দেখে সাধ মিটলো না? তাই না? তাই ঘর ছেড়ে বিবাগী হতে হবেক। যা খুশী তাই করো গে—কি পেয়েছো এই দেহটায়।

হাসে নটবর—দেহে নয় হয়তো তোমার মনে যা পেয়েছি তা সংসারে পাইনি।

—মাষ্টার! মেয়েটির ভিজে শরীরটা নটবরের বুকে, কি নিবিড় চাপে ওকে যেন পিষে ফেলতে চায়। দু'চোখে জল নামে মেয়েটির।

আমাকে কাছে নিও না মাষ্টার। আমি এঁটো পাতা—আঁস্তাকুড়ের ময়লা গো, ন্...না। সরে যায় মেয়েটি। দু'চোখে ওর জল নামে!

নটবর যেন সেই হারানো অতীতের স্বপ্ন দেখছে, শ্যামচিকন একটি মেয়ের চোখে শাওন-মেঘের ধারা নেমেছে। কি ব্যর্থতার কান্নায় গুমরে ওঠে মেয়েটি।

রাত্রির তারা-জ্বলা আকাশে কি বেদনার শিহর জাগে। চেয়ে আছে নটবর মেয়েটির দিকে।

কান্না-ভেজা স্বরে আর্তকণ্ঠে বলে মেয়েটি।

—তুমি যাও মাষ্টার। কোনদিন আর এই কথা বলো না।

এ স্বপ্ন নিয়ে থেকো না। দুঃখে জ্বলেপুড়ে মরছি, তুমি আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না গো!

চলে গেল মেয়েটি।

নটবর তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা কি আঁধারে হারিয়ে গেছে।

নটবর ব্যাকুল আর্তকণ্ঠে ওকে ডাকছে! শোনো—

ধড়মড় করে চটের স্তূপের বিছানায় উঠে বসেছে নটবর। বৃদ্ধের কোটরাগত দু'চোখ জ্বলছে। ওর চীৎকারে সৃষ্টিধরের ঘুম ভেঙে যায়। সে-ও উঠে পড়েছে।

—ওস্তাদ!

—এঁ্যা। তুই! বিড়বিড় করছে নটবর।

কি যেন ব্যাকুল একটি স্বপ্ন দেখছিল সে। ওই স্বপ্নের দেখা যৌবনের শ্যামসবুজ থেকে আজকের নিঃস্বতার বুকে ফিরে আসে সে।

ঘামছে এই শীতে!

সৃষ্টিধর শুধোয়—কি হয়েছিল ওস্তাদ?

নটবর বলে—না রে। কিছুই হয় নি! তুই শো! এখনও রাত অনেক আছে।

বাইরে মেলার কলরব তখনও শোনা যায়। এদের তাঁবুতে ঘুম নামে, সৃষ্টিধর বলে—আর দল নিয়ে বেরুবো না ওস্তাদ। তোমার শরীরটা সুস্থ হোক, দল ততদিন বসতি থাকবে।

নটবর দেখেছে তার দলের সুনাম।

এখানে জেলার বাছা-বাছা মানুষ এসেছে তাদের পালা দেখতে। জেলাকর্তারা নাকি তার দলকে সেরা দল বলে পুরস্কার দেবে।

নটবর কাশছে। কাশি সামলে বলে সে।

—ওসব কথা পরে ভাববি ছিষ্টি! দলের জন্য যৌবন সবকিছু বাজি এড়ে দিয়েছি রে! এখন আর কি আছে বল যে হারাবার ভয়ে পিছিয়ে পালাবো? দল চলছে—চলবে! ব্যস!

বুড়ো যেন তার সব অসুখকেও তুচ্ছ করে তুলেছে কি এক নিশায়। সৃষ্টিধর দেখছে ওকে।

মতিবাবুর নাচের আসরে দেখেছে বাসিনী ব্যপারটা। হেমন্তবালা-ও দেখেছে ওই রবি সরাওগীর ব্যপারটা।

বাসিনী আজকের সমাজে এই মানুষগুলোকে চিনেছে। রবি সরাওগী দেখেছে মতিবাবুকেই ওই নাচিয়ে মেয়েটা চেনে। আর কেউ যেন নেই এখানে।

বাদলও দেখেছে ব্যাপারটা।

রবি সরাওগীর ডাকে বাসিনী যেন নজরই দেয় না।

হঠাৎ রবি সরাওগী পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বলে—লেও জী!

বাসিনী দেখছে লোকটাকে।

মতিবাবু একটু অবাক হয়। এর এখানে এসে রবি সরাওগী ইচ্ছে করেই টাকার গরম দেখাবার জন্যই ফস্ করে ওই নোটটা বের করেছে। মতিবাবু যেখানে দশ টাকা ইনাম দেয়—রবি সরাওগী ওকে পঞ্চাশ টাকা ধরিয়ে দেয়।

হেমন্তবালা বলে—যা বাসিনী, উনি দিচ্ছেন, নে! বাসিনী নোট নিয়ে আসে।

রবি সরাওগী উঠে পড়েছে—চল বাদল! চলি মতিবাবু।

আর দাঁড়ায় না সে। যেন মতিবাবুর ওই ব্যবহারে চটে উঠে ওই পঞ্চাশ টাকা ছুঁড়ে ফেলে চলে গেল সে।

মতিবাবু গুম হয়ে গেছে।

বাসিনী হাসছে। মতিবাবুকে বলে—চলি বড়বাবু!

হেমন্তবালা বলে—একা যাবি?

হাসে বাসিনী। বলে সে—মেলা দেখতে গেছি গো। দমকা রোজকার করলাম, একটু ঘটা করতে হবে তো? ভয় নাই হারিয়ে

যাবো না।

বাঁধনদার জনার্দন বলে—তা নয়। যা ভিড়! সঙ্গে যাবো নাকি?

বাসিনী শোনায়

—ঘাটের মড়ার সঙ্গে আর ঘুরতে পারি না মাসী। একটুন সামলাও তোমার নাগরকে!

জনার্দন ধমকে ওঠে—থাম দিকি। জিবে আটকায় না কিছু?

হেমন্তবালা প্যালা—মজুরীর হিসাব করে উঠবে। এ সময় রোজকারের পুরো হিসেব সে বাসিনীকে দিতে চায় না। তাই বলে—

—ঠিক আছে' যা—বেশী রাত করিসনি। আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি এখান থেকে। বুঝলি—

বাসিনী বের হয়ে যায় মেলার দিকে।

তখন বেশ রাত। হিম হিম জড়তা নেমেছে। ওদিকে মেলার কিছু রমরমা তখনও চলেছে। দোকান-পশার খোলা—শেষ রাত অবধি চলবে ওই কেনা-বেচা—রং-রঙ্গিলার হাটের বেসাতি।

চাদর গায়ে জড়ানো।

বাসিনী মদ বিশেষ খায় না। আজ একটু খেয়েছে, পা টলছে। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় বেশ আমেজ লাগে। সারাক্ষণ ধরে দেখেছে বন্ধ ঘরের মধ্যে ওই ভদ্দরলোকেদের কেলোর কীর্তি।

বুড়ো মতিবাবুর হাতটা যেন সাপের মতো হিম-ঠাণ্ডা, তবু ওর বুক-কোমরে যেন থাবলে মাংস তুলতে চায় শকুনির মতো। দেখেছে রবি সরাওগীর চোখে কি নেশা, পুরুষগুলোর ইতরামিই দেখেছে—মন ভরে উঠেছে কি তীব্র ঘৃণার জ্বালায়। ওই লোভী মানুষগুলো তার বুকের খাঁজের কিছু স্পর্শ পাবার বিনিময়ে সেখানে টাকাও কিছু ফেলেছে! গা জ্বালা করে বাসিনীর। চলেছে মেলার দিকে।

ওদিকে লোকজন দেখে এগিয়ে যায়। আমগাছের নিচে বলিষ্ঠ একটি তরুণ বসেছে জুয়ার ছকের সামনে। চোখেমুখে ওর একাগ্রতা,

চামড়ার বাটিতে ঘুঁটি নিয়ে নাড়ছে। সামনে জুয়ার ছক পাতা—ছটা ঘরে টাকা পড়ছে আর সে সাধকের একাগ্রতা নিয়ে ঘুঁটি ফেলছে। সামনের ছকে টাকার দান পড়েছে।

হাতের টানে এতগুলো লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে সে। সবই কুড়িয়ে নেয় ঈশ্বর তার দিকে।

বাসিনী পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়।

তার ভাগ্য কোনদিনই দেখেনি সে। দেখেছে মেলায় জুয়ো খেলা। অনেককে দেখেছে সর্বস্ব হারিয়ে ফতুর হতে। কেউ কিছু পায় কিনা জানে না সে। বাসিনীর বুকের খাঁজে দলা-পাকানো লোভী হাতের স্পর্শ মাখা নোটগুলো তখনও অস্বস্তি আনছে।

ওই পাপগুলোকে দিয়েই সে দেখবে তার বরাতটা কেমন। বাসিনী এগিয়ে যায় ছকের দিকে।

হাঁকছে গোপী—লাক টেরাই, ধম্মের দান!

—ধম্ম! লে শালা ধম্মের বাচ্চা

হঠাৎ কার গলার শব্দে চাইল ঈশ্বর। একটি মেয়েই দান এড়েছে।

চমকে ওঠে ঈশ্বর, গ্যাসের আলো পড়েছে মেয়েটির নিটোল মুখে—ডাগর কালো চোখের তারায় হাসির ঝিলিক, নরম হাত দুটো যেন কি চকিত প্রশ্ন আনে, তৃষ্ণা আনে ওর পাতলা ঠোঁট দুটো।

বাসিনীও দেখছে ঈশ্বরকে।

একটি মুহূর্ত! কোথায় হাওয়া কাঁপে—রাতের হাওয়া।

কে বলে—কই হে ঈশ্বর, দান আড়ো।

বাসিনী শুনেছে নামটা ঈশ্বর। হেসে ওঠে বাসিনী বাঁধ-ভাঙা ঝর্ণার মত কলস্বরে।

বলে সে—এ্যা! ঈশ্বর হল জুয়াড়ী! ভালো। তারপর ঈশ্বরকে বলে।

—তুমি! তা সবারই বরাত তো তোমার হাতে। লাও দেখি আমার বরাতটা ক্যামন?

আমার তৈরব হাত পুরে এক খাবলা দলা-পাকানো নোট ছিটিয়ে দেয় বাসিনী একটা থরে। বলে সে—রইল দান। দেখি কি আছে বরাতে। মোটা টাকার দানই এনেছে বাসিনী। ঈশ্বর দেখছে রহস্যময়ী মেয়েটির দুচোখে হাসির ঝিলিক। গুপী অবাক হয়।

—ওস্তাদ!

ঈশ্বরও দেখছে টাকাগুলো।

বাসিনীও দেখেনি কে কি দিয়েছে। রবি সরাওলী দিয়েছে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট, দশ টাকারও কিছু আছে, পাঁচের খান-চারেক। কুল্যে শ-দু'-আড়াই টাকাই হবে। এত টাকার দান এখানের ছকে পড়ে না। তাই ঘাবড়ে গেছে গুপী, মনোহর-ঈশ্বর-দর্শকরাও।

ঈশ্বর দেখছে বাসিনীকে। বিচিত্র একটি মেয়ে।

বাসিনী বলে—চুরির ট্যাকা নয় ওস্তাদ, গতর ভাড়া দেবার ট্যাকা, ভাখো মাইরী বরাতে কি আছে! কই—থামলা কেন হে? দান ফেলো?

আশপাশের লোকজনও দেখছে ওকে অবাক হয়ে। চাদর জড়ানো রং-পালিশ করা ওই সুন্দরীর মুখে-চোখে ঝিলিক ওঠে। ঈশ্বর একটু বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

হাসছে বাসিনী—কি গো ওস্তাদ, টাকা তো সবই দিলাম, বলো তাহলে নিজেকেই জুয়োর ছকে এড়ে দিই। জিতে নিতে পারো আমি তুমার, আর না পারলে—তোমাকেই জিতে নেব। রাজী!

চমকে ওঠে ঈশ্বর।

এর আগে কিশোর বয়সে বড় তরফের জমিদারবাবুর জুয়োর ছকে জুতো আড়ার কথা মনে পড়ে।

হাত কাঁপছে—ঘুঁটিটা তবু নাড়ার চেষ্টা করে ঈশ্বর। মনকে ওর চোখের চাহনির কথা ভুলিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে—ঘুঁটির শব্দটা।

সামনে হরজনের ছকে পড়ে আছে মেয়েটির রেওয়া নোটগুলো। এদিক ঈশ্বরের ছকে রয়েছে দু-শ টাকা। ওই হরজনের ছককে বাঁচিয়ে ঘুঁটি ফেলতে হবে ঈশ্বরকে। ভাবছে সেছে ঈশ্বরও।

মেয়েটি বলে—কি ওস্তাদ, বলো নিজেকেই এড়ে দিই।

হাসে ঈশ্বর—যা দিয়েছো সেইটাই যাবে, আবার তুমিই বা যাও কেনে? ওতেই থাক!

বাগিনী বলে—আমার আর যাবার বাকী আছে কি বলো? তা যখন নারাজই—তখন থাক। কই দান হাঁকো!

ঘুঁটি নাড়ছে ঈশ্বর। ওই মেয়েটির সমুচিত জবাব সে দেবেই। হরজনের ঘরের দিক দিয়েও তার ঘুঁটি যাবে না। আওয়াজটা শুনছে—ঘুঁটির ভাষা বোঝে সে। হাঁকছে গুপী। ধম্মের দান—জাহাজ কাঁটা—চিড়িতন—

ঘুঁটিটা পড়েছে চামড়ার বাটি থেকে ছকের উপর। হাতের টানে ঈশ্বর ঘুঁটিটাকে একটু ছোবার চেষ্টা করে অভ্যস্ত হাতে, কিন্তু চমকে ওঠে। আঙুলটা বেবশ হয়ে গেছে যেন! ঘুঁটি পড়েছে—ভাগ্যের দান!

চমকে ওঠে গুপী ওস্তাদ!

স্তব্ধ হয়ে গেছে ঈশ্বরও।

এতদিন পর হঠাৎ আজই সে হেরে গেছে। ঘুঁটি পড়েছে সেই হরজনের ঘরেই ঈশ্বরের সব জারিজুরি মিথ্যা হয়ে গেছে। ওই মেয়েটির কাছে আজ নিদারুণ ভাবে হেরে গেছে এতদিনের পুরানো জুয়াড়ী ঈশ্বর দাস।

স্তব্ধতা নামে সারা আসরে। চুপ করে যায় সবাই।

বাগিনী হেসে উঠে।

—কি গো ওস্তাদ! এ্যা বরাত যে ভালোই লাগছে! এ্যা হেরে গেলে ওস্তাদ। তা বাবু অর্ধ-জমারের দরকার নাই, আমার পুঁজি ফিরিয়ে দাও। তোমার টাকার দরকার নাই।

ঈশ্বর দেখছে মেয়েটিকে।

প্রায় আড়াইশো টাকার ধাকা। হাতের পুঁজি সবই চলে যাবে। কিন্তু এককথায় মেয়েটা সব টাকা ছেড়ে দিয়েছে। একটু অবাক হয় সে।

তবু ঈশ্বরের কারবারী মন এটাকে মেনে নিতে চায় না। বলে সে।

—তা হয় না, পাওনা টাকা তোমায় নিতেই হবে। হারলে আমি তো ওসবই নিয়ে নিতাম। ছাড়তাম না। নাও তোমার টাকা!

হাসছে বাসিনী। ওতে তার লোভ আজ নেই। বলে সে।

—আমার পাওনা টাকার হিসেবটা লিখে রেখো। সময় হলে আদায় করে নেব। এখন তোমার কাছেই থাক।

অবাক হয় ঈশ্বর!

—সে কি! জুয়াড়ীকে বিশ্বাস করো তুমি?

হাসছে বাসিনী—দুনিয়াকে বিশ্বাস করে ঠকেছি। এবার না হয় জুয়াড়ীকে বিশ্বাস করেই দেখি।

ঈশ্বরের খেলার এমনটাই এলোমেলো হয়ে গেছে। রাতও হয়েছে। আজকের রোজগার ভালোই, কিন্তু শেষ দানে ঈশ্বর হেরে গেছে। কেন জানে না ওই মেয়েটির কাছে হেরে গেছে সবদিক থেকেই।

ঈশ্বর বলে—দান তোল আজকের মত।

তহবিল নিয়ে উঠে পড়ে সে। মেজাজটা ভালো নেই।

বাসিনী চলেছে তাদের আস্তানার দিকে।

হাসছে সে—কি হল ওস্তাদ। তুমিও এক জুয়াড়ী, আর আমিও তাই! নিজের জীবনটাকেই পাশার ছকে এড়ে দিয়েছি ওস্তাদ।

দিকে।

তারাজ্বলা আলোয় দেখছে সে মেয়েটিকে। দু'চোখে ওর কি বেদনার আভাস। ঈশ্বরও যেন আজ নিজের মনে কোথায় সেই

বেদনাটাকেই অনুভব করে। নিজেকে সেও যেন জুয়ার ছকেই এড়ে দিয়েছে, আর এতদিন ঘুঁটি বাজিয়ে ভেবেছে অনেক পেয়েছি, কিন্তু কি তার দাম। সব বিবাদ মিথ্যা হয়ে গেছে।

বাসিনী চলে গেছে। তখনও ঈশ্বর দেখছে ওকে। ব্যাপারটা কেমন নাটকীয়ই। এতগুলো টাকা জিতেছিল মেয়েটা, তাও নিল না।

বলে ওঠে ভজন—কি বলছিস ওস্তাজ ছুঁড়িটা ?

ঈশ্বর ধমকে ওঠে—সে খবরে তোর কি দরকার ?

গুপী একটু থেমে গিয়ে বলে।

—ওকে চেন না ওস্তাজ! ও বাসিনী—হেমন্তবালার দলের এক নম্বর, শুধু হেমন্তবালার দলেরই এক নম্বর নয় গো, বিবাক চালকার ঝুমুরদলের টপ! যা নাচে—যেন আগুন ছিটোয়, আর গান গায় যেন বুলবুল গাইছে মাইরি!

গুপী ওই বাসিনীর খবর রাখে। মেয়েটা নাচের আসরে অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দেয়, কিন্তু তাদের আসরে এসে যে এমনি করে তাদের পাক্কা খেলুড়ে ওস্তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে তা ভাবেনি।

আরও অবাক হয় যে জেতা দান এতগুলো টাকাও ওস্তাদের মুখের উপর ছিটিয়ে দিয়ে যাবে তাও ভাবতে পারেনি। সবই তাজ্জব ব্যাপার।

বলে ভজন।

—সাংঘাতিক মেয়ে ওস্তাজ! সাপের মত ছোবল মারে গো! দেখলা না কথার ধার, রূপের ছটার মতই বিজলী ফোটে ওর কথায়।

চুপ করে কি ভাবছে ঈ॰

এ ভাবনার রূপ আলাদা, একটি মেয়েকে ঘিরে তার মনের অতলে এমনি ঝড় উঠবে তা ভাবেনি। গুপীর কথায় ধমকে ওঠে ঈশ্বর।

—থামবি তুই! এ্যাই গুপী।

গুপী থেমে গেল। তবু বিস্মিত হয়েছে সে।

দেখেছে এর আগেও ঈশ্বরের কাছে মেয়েছেলের তেমন নেশা নেই। আজও তাই বিয়ে-থাও করেনি। নাহলে ঈশ্বরকে বিয়ে দেবার জন্যে কত মেয়ের বাপ ঝুলোঝুলি করছে। সেই-ই ওসবে নেই। মদের নেশাও তেমন নেই। বিয়ে থার দিকেও মন নাই ওস্তাদের।

মদ খায় রাত জাগতে হয়, মনের উপর চাপ পড়ে—আর তাদের খেলার আসরে কোন তাঁবু নেই। বাঁধা ঠাঁটও নেই, গাছতলায় বড়জোর একটা চাদরের চাঁদোয়া খাটিয়ে বসে পড়ে সতরঞ্চের উপর। ঠাণ্ডা হাওয়া বয় শীতের মরশুম! রাত জেগে ঠাণ্ডার মধ্যে খেলা চালাতে হয়।

আর ওই খেলায় চাই মানসিক একাগ্রতা। সারা মন দিয়ে ঘুঁটির ভাষা বুঝতে হয়, কৌটার ভিতর হাতের ঝাঁকানি দিয়ে ঘুঁটিকে জীবন্ত করে তুলে ছকে জমা টাকার হিসাব করে লাভ বুঝে নিয়ে সেই ঘরেই দান ফেলতে হয়।

এদিক দিয়ে ঈশ্বর খুব ভক্তিমান।

তার বাবা বলতো—মা লক্ষ্মী রে। ত্যামাকে ভক্তি ভরে ডাকবি। পূজা করবি। পবিত্র টাট! সেখানে যখন বসবি তখন অন্য মন নিয়ে বসবি।

এখনও ঈশ্বর কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর রাতে ভক্তিভরে পুজো করে এই টাট বাটকে। সাক্ষ করে খেলতে বসে ওই দিন। বছরের সাক্ষ। এইখানে বেতাল সে করে না।

আজও নেশা করে নি সে। কিন্তু হঠাৎ সারা মনে ওই মেয়েটির হাসির ঝিলিক কি সাড়া তোলে। তাকে যেন ঘোর লাগিয়ে দিয়েছিল ওই বাসিনী। আর সেই অন্যমনস্কতার দাম দিয়েছে ঈশ্বর হেরে গেছে নিদারুণ ভাবে।

মেয়েটিকে সে চেনে না।

নোতুন দেখেছে মেলায় ওই মেয়েটিকে।

গুপীর ব্যাপাব স্যাপার আলাদা। মেলায় আসে—খেলার সময়

এদিক ওদিক নজর রাখে, চীৎকার করে খদ্দের ডাকে কিন্তু ওই ফাঁকে সে আড়ালে গিয়ে ছু চার ঢোক করে মদও গিলে নেয়। ধরা পড়লে বলে—গলা একটু ভিজিয়ে নিলাম ওস্তাদ! নালে চেল্লাবো কি করে?

আর খেলার শেষে ছক তুলে গুপী রাতের অন্ধকারে গিয়ে ঝুমুর গানের আসরেও হাজিরা দেয়, না হয় কিছু পয়সা খরচ করে কোন দেহপশারিণীর ঝুপড়িতেও ঢুকে পড়ে। শীতের রাতটা বেশ নারীদেহের 'ওমে' কাটিয়ে আড্ডাখানায় ফেরে ঝড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে।

ঈশ্বর গর্জায়—মরবি শালা তুই গুপী! কতোবার বলি এসব করিস না। দোব এইবার পোঁদে লাথি মেরে দূর করে শালাকে। ফের গেছলি ওদিকে?

গুপী চুপ করে থাকে। জানে অন্যায় করেছে সে।

এসব ব্যাপারে ওস্তাজ খুব চটা। ঈশ্বর গজগজ করে।

—এসব ভালো লয় রে। একমন না হলে একাজে বিপদ হয়ে যায়।

আজ নিজেই সেই ভুল করেছে ঈশ্বর। মেজাজ ভালো নেই। ছকের পাট চুকিয়ে আজ উঠে যাবে। এরপর খেলা চালালে আজ হারবে ঈশ্বর।

গোপী দেখছে ঈশ্বরকে। ঈশ্বর শুধোয়।

—মেয়েটা কে রে গুপী? দেকেছিস ওকে এর আগে? মেলায় এসে জুয়োর ছকে এতগুলো টাকা ধুলা মুঠোর মত ফেলে দিলে, আর জিতেও গেল!

ঈশ্বর কিছুতেই ভুলতে পারছে না ঘটনাটা।

গুপীও দেখেছে ওস্তাদের ব্যাপারটা। এই মেয়েকে দেখে ওস্তাদের মাথাও ঘুরে গেছে। অবশ্যি মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতই ওর রূপ যৌবন। হাসিটাও তেমনি ধারালো। ওকে চেনে গুপী। বলে সে।

—ওর নাম বাঘিনী গো। হেমন্তবালার ঝুমুর দলের এক নম্বর নাচিয়ে গাইয়ে গো। খুব নাম ডাক ওর। আর যা গান গায় নাচে ওস্তাদ! আহা!

গুপী যেন স্বপ্ন দেখছে।

ঈশ্বর থমকে ওঠে—থামতো! ওকে যেন কুষ্ঠি-ঠিকুজী আওড়াতে বলেছি। শালার নজর যতো ওই সব দিকেই। তখন বুঝিনি মেয়েটা পাকা জুয়াড়ী।

গুপী চুপ করে থাকে।

আজ সকাল সকাল খেলা ভেঙেছে, গুপীও উসখুস করে। মাল-পত্র, আলো সতরঞ্চিও গোবিন্দের হাতে দিয়ে বলে গুপী।

—ছুটো ট্যাকা দিতি হবে ওস্তাজ, খোরাকী!

কি খাবে গুপী তা জানে ঈশ্বর। অন্যদিন বকাবকি করে, আজ কোন কথা না বলে ছুটো টাকা দিয়ে উঠে পড়ে ঈশ্বব।

ফিরছে সে বাড়ির দিকে।

মেয়েটির কথা ভুলতে পারে না।

মেলার বাইরে তখন অন্ধকার জমেছে। হিম পড়ছে ছোলা যব গমের সবুজ ক্ষেতে। দূরে পিছনে পড়ে রইল মেলার জৌলুস, চলেছে ঈশ্বর। আঁধার পথ, তারার আলোর আভা কি ম্লান আবেশে ভরে তুলেছে চারিদিক।

সবুজ ক্ষেতে, পায়ের পাতায় শিশির বুলোনো ঠাণ্ডা লাগে। মেলা পিছনে রেখে ঘরের দিকে চলেছে ওরা। ঈশ্বরের চোখের সামনে বার বার মেয়েটার ছুটো চোখের চাহনি ভেসে ওঠে। টলটলে দীঘির জলের গহিন রহস্যময় সেই চাহনি।

কেমন আনমনা করে তোলে তাকে।

তারাগুলো শেষ রাতে ঝকমক করে, মনে হয় ওই বাসিনী যেন দূর আকাশের তারার মতই। দূর থেকে কি আলোর আভা নিয়ে রাত-নির্জন পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে, কিন্তু ধরা যায় না।

ও চিরকাল অধরাই থেকে যায়, হাতের নাগালের বাইরে।

বাড়ির কাছে এসে গেছে ঈশ্বর।

পিসীর ঘুম আসেনি।

এমনি রাত করে ফেরা ওই ঈশ্বরের অভ্যাস। পিসীর বয়স হয়েছে, ভেবেছিল ভাইপোর বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করবে। কিন্তু তাও হয়নি। ঈশ্বর তেমনিই বিবাগী রয়ে গেছে। ওই জুয়ার নেশাতেই ডুবে রইল।

ওর ডাকে পিসী দরজাটা খুলে দিয়ে বলে।

—রাতভোর জেগে থাকতে পারবো না। এবার যা হয় ব্যবস্থা ছাখ। গতরে আর কুলোচ্ছে না বাপু।

ঈশ্বরের ঘুম আসে না। বার বার সেই উছল মেয়েটির কথাই মনে পড়ে। কি মাদকতা ভরা স্বরে বলে সে।

—তোমার ছকে নিজেকেই এড়ে দেব ওস্তাদ, পারো তবে জিতে নাও, আর হেরে গেলে—তোমাকেই নিয়ে যাবো।

নাথন ফুঁসছে অন্ধকার তাঁবুতে।

আজ তাকে সব খেলোয়াড়দের সামনে ওই এ্যান্টনি অপমান করেছে, লাথি মেরে এরিনাতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এতক্ষণ জেনারেটারের আলোয় আমবাগানের এদিককার মাঠটা ঝকমক করছিল। তাঁবুর চারিদিকে ঝুলছিল আলোর মালা, কলরব উঠছিল দর্শকদের, ব্যাণ্ডের সুর, ওদিকে মানুষের কোলাহল সব মিলে যেন নোতুন এক জগৎ গড়ে উঠেছিল। সেখানে নিজেদের একক দুঃখ হতাশার কথা ভাবার মত কোন অবকাশই ছিল না।

এখন সব আলো নিভে গেছে। থেমে গেছে কোলাহল—তাঁবুগুলোয় রাতের অন্ধকার নেমেছে। দু’-একটা হ্যারিকেন জ্বলছে ম্লান আভায়।

অন্ধকারে হাতির ডাক—বাঘের চাপা গর্জন ওঠে মাঝে মাঝে, বাতাসে ওঠে ওই জানোয়ারদের বোঁটকা গন্ধ।

নাথন বোতলটা খুলে বসেছে, সামনে রুটি আর মাংস। দু এক টুকরো মুখে দিয়ে ফেলে রেখেছে, খাবারে তেমন রুচি নেই। মদই গিলছে নাথন।

কি ভেবে বের হল অন্ধকারে। বেঁটে মানুষটার দুচোখ জ্বলছে অন্ধকারে।

জুলির তাঁবুটা সে চেনে, আজ এ্যান্টনির অপমানটা তাকে বদলে দিয়েছে। এবার নিজেই একটা চরম পথ নেবে সে। রাতের অন্ধকারে ওখানেই হানা দেবে।

জুলি দেখেছে এ্যান্টনিকে কিছুদিন থেকেই, দশাসই পুরুষ, বলিষ্ঠ সুঠাম গড়ন। আর খেলার জগতে ওর নামডাক আছে, বুনো জানোয়াররাও ওকে ভয় করে। ওর চাবুকের শব্দে বাঘও মাথা নোয়ায়।

হাসছে জুলি—বাঘিনীকে তুমিও বশ করেছো এ্যান্টনি।

রাতের অন্ধকারে জুলি আসে ওর তাঁবুতে।

এ্যান্টনি বলে—এমনি করে চলে আসো, পেরেরা সাহেব যদি দেখতে পায়?

হাসে জুলি। মেয়েটার সাহস বেড়ে গেছে।

নাথন বের হয়েছিল অন্ধকারে, জুলির তাঁবু অবধি যেতে হয় নি। এখানে এই গাছের নীচে এ্যান্টনির তাঁবুর পিছনে ওদের হাসি আর কথার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে। জুলিই এসেছে এ্যান্টনির কাছে।

রাগে অপমানে জ্বলছে নাথন।

মনে হয়, গিয়ে মেয়েটার সুন্দর গলাটাকে টিপে ধরে শেষ করে দেবে, ওর সব সাধ মিটিয়ে দেবে একেবারে।

অন্ধকারে গাছ-গাছালির নীচে বাঘের বদ্ধ খাঁচাটায় গর্জন করছে বাঘটা, হঠাৎ কার হাসির শব্দে চাইল। এগিয়ে আসছে মেয়েটা।

নেলিও দেখেছে নাথনকে ওই এ্যান্টনির তাঁবু থেকে ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে আসতে। নেলির রাগটাও জুলির উপর। কারণ এ সার্কাসে প্রথম যখন এসেছিল এ্যান্টনি তখন এই নেলিই ওর দিকে ঝুঁকেছিল। এ্যান্টনিকে পেতে চেয়েছিল নেলিই।

কেরালার মেয়ে, কালো গায়ের রং—একটা মাংসল চেহারা।

মেয়েটা যেন এ্যান্টনিকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ্যান্টনি একটু দূরে দূরেই থাকতো। ওকে পাত্তাই দিত না।

নেলি বলে—সাহেব বসের বাঘিনীর ফাঁদেই পড়লে নাকি? আমাকে যে চোখেই পড়ে না। এসো—

মদের বোতল দিয়ে ওই নেলিই তাকে যেন নেশা ধরাতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি।

এ্যান্টনিকে ধরে রাখতে পারেনি সে।

জুলি—খোদ মালিকের মেয়েই তার জন্য পাগল। আর ওই সুন্দর মেয়েটিকে এ্যান্টনিও ভালো বেসেছিল।

আজ তারা দুজনে ঘর বাঁধাব স্বপ্ন দেখে।

রাগে জ্বলে ওঠে ওই কালো মেয়েটাও। সে দেখেছে নাথনকেও ওই ব্যর্থ জ্বালা নিয়ে ঘুরতে এই তাঁবুর পাশে।

নাথনকে দেখে এগিয়ে আসে নেলি! কালো চেহারা মাংসল দেহে বাঁধন কিছু নেই। চোখেমুখে কি নীরব জ্বালা ফুটে ওঠে নেলির।

বলে ওঠে নেলি।

—কি হল নাথন? চিড়িয়া উড়ে গেল? ও চিড়িয়াকে বশ করতে পারবি না নাথন, ও বাসা নিয়েছে বড় গাছে। তোর নাগালের বাইরে।

নেলির দিকে চাইল নাথন।

নেলির সারা দেহে মাংসল যৌবনের উচ্ছল মাদকতা। মেয়েটা এগিয়ে আসে, নাথনের গা ঘেঁষে দাড়ালো।

নাথন গর্জাচ্ছে—বেইমান, বেশরম মেয়েটা। দেখে নেব ওকে। ওর পীরিত ঘুচিয়ে দেব।

নেলি শুধোয়—কি করবি ওর? ওই এ্যান্টনি তোকে পুঁতে ফেলবে। জ্যান্ত গোর দিয়ে দেবে। তার চেয়ে যা—তাঁবুতে গিয়ে এক বোতল ধেনো গিলে পড়ে থাকগে। মর্দ—তুই আবার আশনাই করবি। ওই এ্যান্টনি তোর দফা শেষ করে দেবে।

চাপা স্বরে গর্জাচ্ছে নাথন।

—আমিও দেখে নেব ওকে। দরকার হয় গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস ছেড়ে দিয়ে বহরমপুরে এসেছে গ্রেট রেমন সার্কাস ওখানেই চলে যাবো। আমার আবার চাকরির অভাব। তবে যাবার আগে ওদের দেখে নেব একহাত।

নেলি দেখছে ওই বেঁটে লোকটাকে। নাকটা লম্বা—খাঁড়ার মত, ছচোখ জ্বলছে অন্ধকারে। নেলিও তার জ্বালাটার শোধ নিতে চায় ওই এ্যাণ্টনিকে জব্দ করে।

—নাথন!

নেলি ডাকছে ওকে। চমকে ওঠে নাথন।

নেলি বলে—বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা। হিম পড়ছে। চল আমার তাঁবুতে। সেখানে বসে কথা হবে!

নাথন চাইল ওর দিকে। বেঁটে বিকৃত মানুষটার শক্ত খাটো দেহে যেন মাতন জাগে। নেলি ওর হাতটা ধরেছে। বলে।

—কিছু খাবার আছে, বোতলও আছ চল।

নেলি আজ তার স্বার্থে নাথনকে কাজে লাগাবে।

ছোট তাঁবুটার পরিবেশে ঢুকে নাথনও তৃপ্তি পায়। টুলটা এগিয়ে দিয়ে বলে মেয়েটা।

—বোসো! বোতল আর গ্লাস বের করে ঢেলে দেয়। মাংসের কষা এগিয়ে দেয় খানিকটা। নেলি বলে।

—ওখানে কেন? পায়ে ঠাণ্ডা লাগবে। চার পাইয়ে উঠে বোস জুৎ করে।

পোষা কুকুরের মত নাথনও উঠে নেলির মাংসল দেহের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। নেলির ছচোখে কি মাতাল করা আহ্বান, বিকৃত বেঁটে লোকটার হাতটা নেলির গায়ে, শিরশির করে ওর দেহ। মেয়েটা তবু ওর হাতটাকে সহ্য করার চেষ্টা করে আজ।

বলে নেলি—নাথন, তোমার তো অনেক নাম-ডাক। যে কোন সার্কাসের দল তোমাকে লুফে নেবে।

নাথন গর্বভরে বলে—জরুর। এমন ক্লাউন ক'জন আছে সার্কাসের মার্কেটে।

নেলি দেখছে ওকে।

বিকৃত মানুষটার বেঁটেখাটো হাতটা ওর দেহটাকে কাছে টানতে চায়। নেলির হাসি আসে, তবু সেটা চেপে রেখে নেলি বলে।

—আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে নাথন? তোমার সঙ্গেই এ দল ছেড়ে চলে যাবো। ওই এ্যান্টনি জুলিদের দলে আর ঠাঁই হবে না আমাদের। কতোদিন কথাটা বলবো ভেবেছি, দেখ না তো তুমি আমাকে।

নেলি রাতের অন্ধকারে নাথনের গা ঘেঁষে বসে, ওর দেহের উত্তাপ নাথনকে বদলে দিয়েছে।

নাথনের সারা দেহ কাঁপছে। বলে ওঠে নাথন—যাবে? সত্যিই যাবে সুইটি?

—যেতে পারি, কিন্তু ওই এ্যান্টনি জুলিকে এর জবাব না দিয়ে যাবো না নাথন! ওদের শিক্ষা দিয়ে তবে যাবো।

নেলির দেহটা ওই বিকৃত লোকটার দুহাতের আকর্ষণে এগিয়ে যায়। বুঝেছে নেলি শয়তানটা খেপে উঠেছে।

ধূর্ত নেলি হঠাৎ সচেতন বলে—এ্যাই নাথন! কে যেন আসছে এদিকে? ওই এ্যান্টনি নয় তো।

নাথন চমকে ওঠে। ওদিকের কানাত তুলে গুড়ি মেরে বের হয়ে গেল লোকটা ভীতু জানোয়ারের মত।

হাসছে নেলি।

নাথন তখনও অন্ধকারে পালাতে পালাতে কি বিচিত্র স্বপ্ন দেখে। নেলির নরম দেহের স্বপ্ন—ওই এ্যান্টনি জুলিকে জবাব দিয়ে সে

নেল্লিকে দেখিয়ে দেবে নাথনও পুরুষমানুষ। আঘাতের প্রতিঘাত সে দিতে জানে।

বহরমপুর থেকে খবরও এসেছে। চাকরি হয়ে যাবে।

সকাল হয় তাঁবু বসতিতে। সকালে ওদের কিছু নোতুন খেলার অনুশীলন করতে হয়। এ্যান্টনি সব প্লেয়ারদের নিয়ে অনুশীলন করায়, ওতে বডি ফিট থাকে। জল-খাবারও আসে এখানেই। আর জানোয়ারদেরও দেখ-ভাল করে তারপর।

নাথনের ওপর ওই জানোয়ারদের খাবার দেবার ভার। বাজারের কসাইখানা থেকে আসে ভাল ভাল মাংস। বাচ্চা মোষের মাংসই বাঘদের জন্য বরাদ্দ। হাতির খাবার দেবে মাহুত। ঘোড়ার খাবার ছোলা-গম ভিজে, কিছু সরু করে কাটা খড় এসব দেওয়া হয়।

নাথন দেখছে মাংসের ঝুড়িটা, ওর থেকে বরাদ্দ মাংস বাঘের খাঁচায় দিতে গিয়ে তেজী নোতুন বাঘিনীর খাঁচার সামনে দাঁড়ালো। বাঘিনীটাও মাংসের গন্ধ পেয়ে থাবা মারছে খাঁচার গায়ে, গর্জাচ্ছে। কিন্তু নাথন এদিক ওদিক চেয়ে ওকে খাবারই দিল না। অন্য বাঘ-গুলোকে খাবার দিয়ে ওর দিকে শুকনো হাড় দু একটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল। বাঘিনীটা এমনিতেই নোতুন। এখনও বশ হয় নি, নেহাৎ এ্যান্টনির ভয়ে খেলা দেখায় বেশ রাগত ভাবেই। খাবার না খেয়ে বাঘিনীটা গজরাচ্ছে—আ ও-ক্। বেশ রেগে উঠে গর্জাচ্ছে সে।

নাথন সরে গেল ওখান থেকে কাজ সেরে।

ওদিকে মাহুত হাতিটাকে কলাগাছ—পাতা ডালের রাশি খেতে দিয়েছে। ঘোড়াগুলোও চটের থলেতে মুখ লাগিয়ে ছোলা ভিজে গম ভিজে খাচ্ছে।

রাগে খিদের জ্বালায় বাঘিনীটা গজরাচ্ছে তখনও।

এ্যান্টনি তখন প্লেয়ারদের নিয়ে এরিনায় অনুশীলনে ব্যস্ত।

পেড্রোরাও রয়েছে। একটা চেয়ারে বসে বুড়ো চিৎকার করে—

হ্যারি আপ, ম্যান। ইউ নেলি, বি স্টেডি। এ্যান্টনি রোপ কা খেল—নেলিকো ঠিক সে করনে বলো। জুলি কাম অন্! ট্রাই এগেন। নেলি, ইউ বিচ্, ট্রাই টু মেক ছা ফিগার পারফেক্ট! এতনা মোটকা হোগা তব ছুট্টি কর দেগা তুমকো।

ক্যা খেল?

বুড়ো এখনও সবদিকে নজর দিয়ে চলেছে। নেলি রেগে উঠেছে। তবু চুপ করে থাকে।

নাথন কাজ সেরে এবার ঢুকতে পেরেরা গর্জন করে ওঠে।

—ক্যা করতা ম্যান? এতনা দের কাহে? নয়া কুছ জোক দেখাও—ক্যা জোকার তুম? ড্যাম সোয়াইন অল্ বলস্! কাম অন্ ইউ ব্যাস্টার্ড।

নাথন মুখ তামাটে করে রিং-এ নামে। এর নামই জোকার। নিজের মান অপমান বোধ নেই, থাকলে চলবে না। তার প্রেম ভালবাসার কোন দাম নেই। বিকৃত—একটা বেঁটে মানুষ। সব হারিয়ে এই অপমান জ্বালা বয়েই ফিরতে হবে তাকে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বুড়ো পেরেরা গর্জে ওঠে—ইউ বাস্টার্ড!

একটা লাথি কষে দেয় বুড়ো ওর পাছায়।

হঠাৎ কি রুদ্ধ অপমানে কেঁদে ওঠে নাথন, আর্ত অসহায় কান্না সে কাঁদছে। হেসে ওঠে পেরেরা! হাসছে খেলোয়াড়রা—হাততালি দিয়ে ওঠে এ্যান্টনি।

—সাবাস! নাথন গুড জোক।

ওর বুকফাটা কান্নায় এরা হাসছে।

বুড়ো পেরেরা খুশি হয়ে পাঁচ টাকার নোট বের করে বলে—লেও বেটা। সাবাস! হর রোজ এহি আইটেম দেখানে হোগা।

কাঁদছে নাথন এখনও। সত্যিকার এ কান্না।

তার কান্নাও এদের কাছে হাসির বস্তু হয়ে উঠেছে। চোখ মুছে

নাথন টাকাটা নেয়। মনে মনে সেই সত্য জেগে ওটা সাপটা ফুঁসছে।

জুলিও হাসছে ওর বিকৃত কান্নায়।

নেলি দেখছে মানুষটাকে, ওই একমাত্র জানে কান্নাই এটা, আর এই কান্নার কি পরিণতি হতে পারে সেটা জেনে নেলিও খুশি হয়েছে।

নেলির তালিম-ই কাজে লেগেছে।

ওই বেঁটে লোকটা দেখছে নেলিকে। একা সেই-ই হাসে নি। সেটা দেখেছে ওই নাথনও। দুজনের মধ্যে কি যেন একটা নীরব চাহনি-বিনিময় হয়ে যায়।

আবার প্র্যাকটিস চলতে থাকে। জুলিও 'বার'-এর অনুশীলন করছে। নাথনও তার দেখাদেখি 'বারে' প্র্যাকটিশ করতে গিয়ে যেন হাত ফসকে উলটে পড়েছে। সামার সল্ট খেয়ে বেঁটে দেহটাকে শূন্যে ছিটকে তুলেছে নাথন।

পেরেরা খুশী হয়—গুড শো।

নাথন আজ মন দিয়ে অনুশীলন করছে ওদের সঙ্গে বড় সাহেবের সামনে।

এ্যান্টনিও দেখছে ওর খেলাগুলো। সুন্দরই হচ্ছে। আর পোজ-গুলোও ওর হাসি আনে। অভিনয়ও ভালো করে নাথন। আজ সে সুন্দর অভিনয় করে চলেছে।

বাদল ঘোষ দেখেছে কাল রাত্রে রবি সরাওগীর নোতুন রূপটাকে। ঐ ঝুমুরওয়ালি মেয়েটার অপমান সে ভোলেনি। মতিবাবুই বোধহয় তাকে অপমান করার জন্য তার নিজের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য মেয়েটাকে রবি সরাওগীর কাছে আসতে দেয় নি।

বাদল ঘোষ সকালেই সরাওগীর বার-বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। মেলা কমিটির অন্য কয়েকজন মেম্বারের সঙ্গেও কথা বলেছে।

পণ্ডিত মাস্টারকে বাদল হাতে এনেছে। বলে—সরাওগীজীকে এবার প্রাইজ দেবার মিটিংএ প্রেসিডেন্ট করতে হবে মাস্টার।

পণ্ডিত হিসেবী ব্যক্তি। কিছুটা ব্যাপার বুঝে নিয়ে বলে সে—কিন্তু মতিবাবু আছেন!

নিমাই সাহা অন্য একজন মেম্বার। সরাওগীর গুদাম থেকে, সে ধার-বাকিতে মালপত্র নেয়। নিমাই বলে।

—মতিবাবু তো মেলা কমিটির চেয়ারম্যান, তাই বলে সরাওগীজী কেন এই মিটিংএ প্রেসিডেন্ট হবেন না হে?

বাদল বলে—তোমাকে খুশী করে দেব মাস্টার। রবিবাবুর হয়েই কথাটা বলবে তাহলে। নিমাই, তুমি বরং ভূপতিবাবুকেও বলো কথাটা।

নিমাই ঘাড় নাড়ে।

সব ব্যবস্থাই করেছে বাদল। এবার রবি সরাওগীর ওখানে এসেছে সে।

রবি সরাওগীও কাল রাতে দেখেছে ব্যাপারটা। বাদলকে এসে আজ ওই কথা পাড়তে দেখে বলে।

—ছোড়ো উ বাত বাদলবাবু?

বাদল ঘোষ দরদ দেখিয়ে রবি সরাওগীকে হাতে আনতে চায়। বলে সে—না, সরাওগীজী, আপনাকে অপমান করবে ওই মতিবাবু আর খোকন মিস্তির এ আমরা সইব না কিছুতেই। দেখে নোব। আর বলেন তো ওই নাচওয়ালীকেই নিয়ে এসে আপনার বাগান-বাড়িতে মুজরো করে দিই।

রবি সরাওগীর এসব ইচ্ছা ইদানীং হলেও তার ঘরবালীর জন্য এসব করতে ভরসা হয় না।

বলে সে—ছোড়ো ইসব বাত বাদলবাবু।

বাদল ঘোষ দেখছে ওকে।

মতিবাবুর এখনকার অবস্থা সে জানে। মতিবাবু সেদিনও রবি

সরাওগীর কাছে বেশ কিছু টাকা ধার নিয়েছে, এখনও শোধ দিতে পারে নি।

তার জন্য অবশ্য মতিবাবু বাজারের একটা বাড়িই বন্ধক রেখেছে, রবি সরাওগী এসব বুঝেও চুপ করে থাকে।

নিমাই সাহা বলে।

—ওসব না হয় নাই করলেন সরাওগীজী। প্রাইজ দেবার মিটিংয়ে আমরা চাই আপনিই প্রেসিডেন্ট হবেন। মতিবাবু সব ব্যাপারে কেন থাকবেন ?, ওই খোকন মিত্তির তো সব প্যাঁচ কসছে। মায় ঈশ্বরকে হঠাবার কি কম চেষ্টা করেছে ! ওই নন্তুকে বসাবার জন্য ! আবার আপানাকেও প্রেসিডেন্ট করাতেও অমত। এ সইব না ! দরকার হয় কমিটিতে ভোট হোক !

বাদলও সায় দেয়—তাই করাবো। ওই খোকন মিত্তিরের শয়তানী ঘুচিয়ে দেব, সেক্রেটারী হয়েছে।

বাদল ঘোষ সেক্রেটারী হবার চেষ্টা করেছিল, ওতে দুপয়সা বেশ ভালোই আমদানি হয়। তাই তার রাগ। বাদল ঘোষ এবারই রবি-বাবুকে সামনে আনবে, সামনের বছর মেলা কমিটির চেয়ারম্যান হবে রবি সরাওগী, আব সে নিজে হবে সেক্রেটারী। এখন থেকেই সেই পথ করে রাখছে।

রবিবাবু বলে—এত গোস্‌সা কেনে ?

বাদল ঘোষ জানায়।

—অন্যায়কে সহ্য করবো না সরাওগীবাবু। আপনি আমাদের কথাটা রাখবেন।

ডি. এম, এস. ডি. ও. সাহেবরা আসবেন। এম্-পিও থাকবেন। এ মিটিংএ রবিবাবুও সভাপতি হতে চায়। ছবি উঠবে, সদরের কাগজে নাম বের হবে।

তাই রবি সরাওগী যেন ওদের চাপে রাজী হবার ভান করে।

—ঠিক আছে।. আপনারা বলছেন যখন হবো। লেকিন—

বাদল ঘোষ বড়ি খেয়ে কয়ে।

—না, না। কোন ওজর আপত্তির কথা শুনবো না স্যার। এ আমাদের সকলের সাধারণ মানুষের রিকোয়েস্ট। আপনি একটু খর্চা সামান্য করবেন দরকার হলে, তারপর আমরা দেখবো।

নিমাই সাহা বলে—মতিবাবু কি বার হয়, এবার আপনি হবেন।

রবি সরাওগী কি ভেবে মত দেয়।

রবি সরাওগী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস. পি সাহেবকে একটু হাতে রাখতে চায়। বলে সে—মিটিন কা ফটো খিচতে হবে। ফটা-ফট্।

বাদল ডাক্তার বলে—হবে! চলুন। আজকের কমিটি মিটিংয়ে সব বন্দোবস্ত করে দিই। সাতজন মেম্বারের পাঁচজনকে হাত করেছি। কিছু খরচা হবে সরাওগীজী, ধরুন পতিতবাবুকে নোতুন সিল্কের চাদর দেব বলেছি আর বসন্তবাবুকে দিতে হবে এক জোড়া নোতুন জুতো। আর এক বোতল বিলেতী।

হাসছে রবি সরাওগী—হবে। আভি দে দেও উদের।

নিমাই সায় দেয়।

—যা বলেছেন। ওরা দুটোই শয়তান। হাতে মাল না পেলে মিটিং-এ বেগড়বাই করতে পারে।

মতিবাবু এসব মিটিং-এ কর্তৃত্ব করেছেন এতকাল। তাই জানেন—কমিটিতে তিনি যা বলবেন তাই হবে।

সকালে মেলা-কমিটির মিটিং বসেছে।

কাল রাত্রের নাচমহলের নেশার জের কাটেনি। মিটিং-এ বসে এবার মতিবাবুর সেই জেরটা কেটে যায়। চমক লাগে বাদলদের কথা শুনে।

খোকন মিস্ত্রির এসব ব্যাপারে কথা বলে না। সে চুপচাপ দেখে যায় মাত্র। কাল থেকেই সে দেখছে কাণ্ডটা।

ওই নিমাই সাহা কমিটিতে ঢুকেই রবি সরাওগীর সঙ্গে ভিড়েছে।

তাদের লোক ওই ঈশ্বরকে জুয়ার ডাক দিয়েছে। আর নন্তুকে তারাই মারধোর করে সব কেড়ে নিয়েছে। এ যেন খোকন মিত্তিরকেই মেরেছে তারা। তবু খোকন চুপ করে থাকে।

আজ আবার মতিবাবুকেই শোনায় নিমাই।

—এবার প্রেসিডেন্ট হবেন রবিবাবু কালিকের মিটিং-এ।

চমকে ওঠে খোকন মিত্তির। এতদিন একথা কেউ বলতে সাহস করেনি, আজ ওরা করেছে। আর দলবেঁধে পরামর্শ করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রবি সরাওগীর জন্য কথা বলতেও গেছে তারা। মতিবাবুকেও এবার হঠাতে চায়। খোকন ভাবছে কথাটা।

আরও অবাক হন মতিবাবু নিজে।

নিমাই সাহা, বাদল ডাক্তার, পতিত ঘোষ, বসন্ত সরকারও ওর দলে।

মতিবাবুর মুখটা তামাটে হয়ে ওঠে। কিন্তু মতিবাবু চতুর লোক। জানেন তিনি কিভাবে ওদের ঘা মারতে হয়। মেলা কমিটির কাছেই ভাড়া আদায় বাবদ টাকার বারো আনা রকম দাবি করবেন। তখন দেখা যাবে ব্যাপারটা। সে-সব কথা না তুলে মতিবাবু বলে ওঠেন।

—বেশ তো। রবিই হবে। আমিও তাই বলি, একজনকে বার বার এসব ভার দেওয়া কেন। উনিই সব করবেন। রবিবাবুই ভার নেন।

অবাক হয় বাদল ডাক্তার। বিনা প্রতিবাদে এভাবে মেনে নেবেন তা ভাবেনি তারা।

বাদল ডাক্তার সবদিক থেকেই তৈরি হয়ে এসেছিল আজকের মিটিংএ। কালকের সভায় ডি. এম. অন্য আর কর্তারা থাকবেন। এগ্-জিবিশনে যে যা জিনিসপত্র দিয়েছে তাদের ভালোমন্দ বিচার করে প্রাইজ দেওয়া হবে। কিছু গুণীজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। শিল্পী-দের পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঐ মিটিংএ তারা রবি সরাওগীকে বসাবেই, তাই সোজা কথায় নাহলে বাঁকা পথ নেবার জন্যও তৈরি ছিল তারা। বাদল ঈশ্বরকেও নিয়ে এসেছিল।

ঈশ্বর অবশ্য একা আসেনি। গুপী, মদন, কানা বঙ্কিম তার কিছু চেলাকেও এনেছিল। আশপাশেই আছে তারা। দরকার হলে গোলমাল পাকিয়ে তুলবে।

কিন্তু সে সব কিছুই করতে হয় নি।

মতিবাবু এককথায় রবি সরাওগীকে প্রেসিডেন্ট-এর পদ ছেড়ে দিয়েছে। শুধু কালকের মিটিং-এর জন্যই নয়, মেলা কমিটির প্রেসিডেন্টই করে দিয়েছে তাকে।

কিন্তু খোকন মিস্তির সেক্রেটারী রয়ে গেছে। তবু বাদল খুশি, একটা জিত তার হয়েছে। সামনের বছর থেকে রবিবাবু আর সেইই আসবে।

ওরা শোভাযাত্রা করে বের হয়ে যায়।

ঈশ্বরের হাত লাগানোর দরকার হয়নি। তবু ঈশ্বরও চলেছে সরাওগীজীর সঙ্গে।

বাদল ঘোষ তড়পাচ্ছে—টঁ্যা ফুঁ করলে মজা দেখাতাম আজ। সাধে ঘাড় কাৎ করেছে? এবার ওই খোকন মিস্তিরকেই দেখে নোব।

মতিবাবু চুপ করে ওই প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছে।

সেও দেখেছে রবি সরাওগী দল বেঁধেই এসেছে। কিন্তু খোকন মিস্তির এটাকে খুব ভালোভাবে নিতে পারেনি। সে বুঝেছে বাদল ঘোষ-এর দল এখানেই থামবে না, এর পর তাকেও ঘা মারবে।

আর খোকন মিস্তির এটাকে চুপ করে সইবে না।

বলে সে মতিবাবুকে—আজকের ব্যাপারটা দেখলেন বাবু? ব্যাটারা মতলব করে এসেছিল। আপনাকেও এভাবে অপমান করলো, ভাবছেন চুপ করে থাকবো?

মতিবাবু চাইল। আজ সেই দাপট তার নেই। তাই চুপ করে সয়েছে ওদের অপমানটা।

এ ছাড়া পথ ছিল না। খোকন মিত্তির চতুর লোক।

বলে সে—সোজা পথে না হলে গোলমাল ও বাধাতো।

মতিবাবু অবাক হয়—তাই নাকি ?

খোকন মিত্তির বলে—দেখলেন না ঈশ্বকেও সঙ্গে এনেছিল ? ব্যাটা বাইরে তৈরি ছিল দলবল নিয়ে। দরকার হলে ঝাঁপিয়ে পড়তো !

মতিবাবু অবাক হয়।

তার চাপাপড়া নীলরক্তে মাতন জাগে। এককালে পোষা গুণ্ডার দলই ছিল তাদের, অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য।

আজ ওই রবি সরাওগীর মত একটা পুঁচকে ব্যবসাদার এসেছিল এখানের বনেদী জমিদার মতিবাবুকে শাসাতে।

মতিবাবু এখনও মরেনি !

চাপাপড়া বারুদের স্তূপে যেন আগুন পড়েছে।

মতিবাবু বলে—তাই নাকি ? তা খোকন মিত্তিব তুই কি মরে গেছিস নাকি ? নদেরচাঁদ—বিষণদের দলবলও নাই যে ঈশ্বরদাস ছাতি ফুলিয়ে বেড়াবে আমার সামনে ?

খোকন মিত্তিরও এইটাই চাইছিল।

ক্রমশঃসেজবাবুকে তাতিয়ে সে এবার ঠিক পথে এনেছে। নদেরচাঁদকে কাল ঈশ্বরের দলের লোকজনরা মেরেছে, সব কেড়ে নিয়েছে। নদেরচাঁদও তৈরি ছিল।

খোকান মিত্তির সেজকত্তার সাহস পেয়ে বলে।

যদি অভয় দেন তাহলে রবির ডান হাত ওই ঈশ্বর দাসকেই আগে ঠাণ্ডা করে দিই। তারপর বাদল ঘোষটোষ তো চুনোপুঁটি। ওদের সিধে করতে সময় লাগবে না।

মতিবাবু এই অপমানটা ভুলতে পারে না।

বলে সে—তাই কর। তবে সাবধানে করতে হবে যেন বেশি

লোক জানাজানি না হয়, আর ব্যাপারটা করতে হবে অন্য ছল করে।

খোকন মিত্তির সে পথের সন্ধানও করে রেখেছে।

বলে সে—ওর জন্য ভাববেন না। যা প্যাঁচে কাজ হাসিল করবো কেউ জানবে না যে আমরা এ সবের মধ্যে আছি।

মতিবাবু সায় দেন—হ্যাঁ! তাই দেখবি। দিনকাল ভালো নয়, সামলে শুমলে কাজ হাসিল করতে হবে।

খোকন মিত্তিরও তা জানে। খুশি মনে চলেছে সে নদেরচাঁদকে খবরটা দিতে।

নদেরচাঁদও কাল রাতে মারধোর খেয়ে রাগে ফুঁসছে। তার দলবলও তৈরি। শুধু কত্তাদের কাছে একটা কথার অপেক্ষায় আছে তারা।

গর্জাচ্ছে নদেরচাঁদ—কালই দিতাম ব্যাটা ঈশ্বরকে ঠাণ্ডা করে, শুধু মিত্তিরের কথায় থামলাম।

দলের সকলের সামনে নদেরচাঁদ নিজের সম্মান রাখার জন্যই এ সব কথা বলছে। এমন সময় স্বয়ং খোকন মিত্তিরকে আসতে দেখে চাইল!

ইশারায় বাইরে তাকে ডাকছে খোকন মিত্তির। নদেরচাঁদও এবার খুশি হয়ে এগিয়ে যায় ওর দিকে।

...বাদল ঘোষ এর মধ্যেই কাজে নেমে গেছে।

রবি সরাওগী বলে—প্রেসিডেন্ট তো বানালে, এখন ঝামেলা সামলাবে কে? বহুৎ ঝামেলা! সব প্রাইজ কমিটির লোকদের রিপোর্ট নিয়ে ফাস্-সেকেন-সব বানাতে হবে।

বাদল ঘোষ ইতিমধ্যেই দু-একজনকে নিয়ে বসে পড়েছে ওই কাজে। বাদল বলে—ওসব ভাববেন না। সব হয়ে যাবে।

চাষীদের—জমির মালিকদের দুচার জন কম্নিতকর্মা ব্যক্তি আছে। বাদল ঘোষ তাদের ডেকে আনিয়ে বলে।

—প্রাইজ পাইয়ে দেব। কিন্তু তোমাদের নাম বের হবে—ডি. এম. সাহেবের হাত থেকে প্রাইজ পাবে। আমাদেরও তো খুশি করতে হবে!

অর্থাৎ বাদল ঘোষ এই অল্প সময়ের মধ্যেই কিছু পাবার পথ খুঁজে নিয়েছে।

বসন্তবাবু বলে—দু-বস্তা আলু দিয়ে আসবো আজই বাদল।

বাদল ঘোষ জানায়—ঠিক আছে। কি হে মোড়ল। তোমার জমির ও ফসল প্রাইজ পাবে। আমাকে তো বাপু দেখতে হবে।

মোড়ল জানায়—বাড়ির গুড় একটিন দোব আজই।

বাদল ঘোষ খাতাপত্র নিয়ে সব নামটামগুলো লিখছে। পণ্ডিত মাস্টার, বসন্তবাবু, বিজয় ঘোষ আরও দু একজনকে নিয়ে চলেছে এগ্‌জিবিশন-এর জিনিসপত্র দেখতে। সেইই নিজে প্রাইজ কমিটিও খাড়া করে ফেলেছে।

চাষীরা দূর-দূরান্তরের গ্রামের মাঠে নিজেরা খেটেখুটে ভালো জাতের বীজ কলকাতার ভারত নার্শারী, ভারতলক্ষ্মী নার্শারী ইত্যাদি নাম করা প্রতিষ্ঠান থেকে আনিয়ে চাষ করেছে। তারই কিছু নমুনা তারা এইসব প্রদর্শনীতে পাঠায়। নানা শব্জী-ফলও আসে এখানে।

তাদের অনেকের কাছে টাকাটা বড় নয়, স্বীকৃতিটাই বড়। ডি. এম. সাহেবের হাত থেকে প্রাইজ নিয়ে তারা মনে করে তাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

সরকারও চান সত্যিকার চাষীদের চাষ, তাদের জমির ফলন, ফসলের মান উন্নত করার জন্য; কিন্তু সরকারী সহযোগিতা থাকলেও অন্য পথ দিয়ে সেগুলোর অপব্যবহার করাও হয় অনেক ক্ষেত্রে এই বাদল ঘোষেদের সব লোকদের জন্যই।

এবার বাদল ডাক্তার হাতে যেন রাজ্য পেয়েছে। প্রাইজ কমিটির সেইই কর্তা। মতিবাবুদের সরিয়ে দিয়ে রবি সরাওগীকে এনেছে।

বাদল ঘোষ এখন রাতারাতি কৃষি-বিশারদ হয়ে গেছে আর সেই

সঙ্গে পণ্ডিতবাবু, আর বসন্তবাবুর দু'-একজন লোককে নিয়ে পুরস্কার পাইয়ে দেবার কথা ভাবছে তারই অনুগত পেটোয়া কিছু লোককে।

বসন্তবাবুর ভাগচাষী ইরফান এনেছে সরেস জাতের বাঁধাকপি, ফুলকপি। তার চাষে এবার কলকাতার ভারত নার্শারীর বীজ এদিকে সাড়া এনেছে। টম্যাটো করেছে তার ভাইপো রহিম, নীরু হালদার করেছে বিরাট আখ, তারা আশা করে প্রাইজ পাবেই।

বাদল ঘোষ দলবল নিয়ে সব জিনিস-পত্র দেখছে। বাদল এর মধ্যেই তৈরি হয়েছে, পরনে খাকি পোশাক, পায়ে কেডস—কাঁধে মেলা কমিটির হলুদ ব্যাচ লাগিয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে নামধাম লিখতে লিখতে বলে।

—সব সায়লেন্ট হয়ে বসো গে। এবার মিটিং শুরু হবে। যার যার নাম ডাকা হবে এসে প্রাইজ নেবে।

মেলায় আগত কিছু লোকশিল্পীকেও এরা পুরস্কৃত করেন। তার ভারও পড়েছে বাদলের উপর। রবি সরাওগীও রয়েছে। বাদল কয়েকজনকে এনেছে, সরাওগী বলে।

—ব্যাস! এই ক'জন!

বাদল বুঝতে পেরে বলে।

—আর একজনকেও দিচ্ছি সরাওগীজী, দারুণ হবে! মানে—কালকের সেই মেয়েটিকেও প্রাইজ দেবার কথা ভাবছি। সেই লোকশিল্পী বাসিনীকে। সেই নাচওয়ালীকেও।

রবি সরাওগী কাল নাচের মজলিসে মেয়েটিকে দেখেছে। মনের ভিতর ঝড়ও উঠেছিল, কিন্তু তেমন কিছু করতে পারেনি, আজ বাদলকে এগিয়ে এসে তাকে প্রাইজ দেবার কথা বলতে রবি সরাওগীও খুশি হয়।

বাদল ডাক্তার নিজে এসেছে বাগানের এদিকে হেমন্তবালার দলের বাসায়। অস্থায়ী বাঁশ তালপাতা—ছন দিয়ে বানানো ঘর।

এদিক ওদিকে বসে রোদ পিঠ করে চা খাচ্ছে দলের মেয়েরা। হেমন্তবালা সকালে স্নান সেরে এখন সামান্য ঠাকুর-পূজা করে বাইরে এসে চা খাচ্ছে, গত রাতের নাচ-গানের ক্লান্তি তখনও মুছে যায়নি বাসিনীর দেহ-মন থেকে। মনে পড়ে সেই জুয়াড়ী ছেলেটির কথা। ওর চোখেমুখে দেখেছিল কি সাড়া।

এমন সময় ফুল্লরার ডাক শুনে চাইল বাসনী।

—কে ডাকছে তোমাকে, মাসীর কাছে বসে আছে। চলো বাসিনী।

বিছানা ছেড়ে উঠে এল বাসিনী ঘুম চোখে। চাদরটা আদুড় গায়ে জড়ানো।

বলে ওঠে—সাত সকালে কুন নাগর এলো মাইরি!

বাদলকে দেখেই চিনেছে সে। কাল রাতের সেই ছুক-ছুক স্বভাবের লোকটা এসেছে। ওদের মতলব একটাই—সেটা বাসিনীরও অজানা নয়। বাসিনী শুধোয়।

—কি গো বাবুমশায়, বিয়েন বেলাতেই হানা দিয়েছো কি ব্যাপার? আর ওই নাচের মজলিসে যাবো নাই মাসী, বলে দাও। ওখানে যা হয়, তা জানা আছে। কি আমার ভদ্দরলোক রে সব?

হেমন্তবালা দেখছে বাসিনীকে। বলে সে।

—থামতো বাছা। সকাল থেকেই এত ম্যাজাজ কেন? এ্যাঁ!

হাসে বাদল ঘোষ—না, না। আজ বৈকালে তোমাকে লোক-শিল্পী হিসেবে প্রাইজ দেওয়া হবে।

—লোকশিল্পী—শিল্পী আবার কি জিনিস হে? এ্যাঁ! বাসিনী হেমন্তবালার সামনে চেপে বসে বলে।

—অ বাবুমশায় সিগ্রেট ফিগ্রেট আছে তা দাও কেনে? কথাটা বুঝতে পারছি।

বাদল ঘোষ সিগ্রেট বের করে ধরিয়ে দিতে বাসিনী লম্বা একটান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুধোয়।

—ওসব কি গা ? ওই যে বল্লে লোকশিল্পী, না কি ?

বাদল ঘোষ লোকশিল্পীর পরিচয়-টরিচয় দিতে বাসিনী বলে।

—তা শেষমেষ কিছু ঝামেলা হবে না তো অ মাসী ? তুমি বাবু লোক সুবিধের লও, যদি তেমন কিছু দেখি আমিও ছাড়বো না তোমাকে!

হাসছে বাদল ঘোষ।

—কি যে বলো বাসিনী।

বাসিনী বলে—ওসব কথা কি আর বলি সাধে গো। যারা ছোটলোকগিরি করে তাদের চিনি,-আর ভদ্দরলোকের চামড়া গায়ে দিয়ে যখন ইতরামি করে তাদের কি বলবো বলো দিদি ?

হেমন্তবালা এর মধ্যে খাতির করে বসিয়েছে বাদল ঘোষকে।

বাদল বলে—এবার মেলার সব ভার পড়েছে কালকের মিটিংয়ে আমার উপর! মতিবাবু নয়—প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন রবি সরাওগী, বিজনেসম্যান!

বাসিনী শুধোয়—সি আবার কি গো ? লাও ঠ্যালা।

হেমন্তবালা বলে—ও তুই বুঝবি না। মস্ত লোক কিনা, নাও বাবা, চা খাও।

বাদল চা খেতে খেতে বলে।

—তাই লোকশিল্পীদের প্রাইজ দেবার কথা উঠতে রবিবাবু তোমারই নাম করলো। মতিবাবু তো বলে—আবার এসব কেন ? আমি বললাম—ওদের স্বীকৃতি দিতেই হবে।

জনার্দন বাঁধনদারও এসে বসেছে।

বলে সে—তা ভালো করেছেন বাবু। বাসিনী সত্যি বড় শিল্পী।

বাদল ঘোষ বলে—তাই ওকেই পুরস্কার দিচ্ছি। চলি, আজ বৈকালে আসবে প্যাণ্ডেলে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে প্রাইজ দেবেন।

বাদল চলে গেল।

বাসিনী বলে—কিছু হবে না তো মাসী। লোকটা কি সব বলে গেল। হাসে জনার্দন। সে এসব পুরস্কারের কথা শুনেছে। বলে সে—না রে। এ সম্মানের ব্যাপার। পুরস্কার পাওয়া শিল্পী বলে কথা? ক'টা আছে রে? বুঝলা মাসী, এবার তোমার দলের হ্যাণ্ড-বিলে ওই 'পুরস্কৃত শিল্পী' কথাটা লিখে দিতে হবে। দেখবে বায়নাও বেড়ে যাবে, দলের ইজ্জত বাড়বে।

হেমন্ত খুশী হয়। বলে সে।

—এবার বুঝে সুঝে চল বাসিনী। পেরাইজ টেরাইজ পেলি, দাম বাড়াতে হবে। অমনি ছুটপাট করে মেলায় দাপিয়ে বেড়াবি না।

বাসিনী এসব মানতে চায় না। বলে সে।

—ওসব পেরাইজ, মেডেল তোমার গলায় ঝুলিয়ে দেব মাসী। পরে সেজেগুজে বসে থাকবে ঢ্যাপের ড্যালার মতন। আমার ওসব পোষাবে না! লোকশিল্পী ধ্যাত্তেরি!

নটবর-এর জ্বরটা কমেছে। কিন্তু সারা শরীরের বেদনা। কাশির বেগও রয়েছে। সৃষ্টিধর বলে।

—রাশু ডাক্তার ডেকে আনুক কত্তা।

সকালের মিষ্টি রোদে চাদর জড়িয়ে বসেছে নটবর। শীতের সকাল, ঝকঝকে রোদ-এর উত্তাপটা তার জীর্ণ দেহে একটু উষ্ণতা আনে।

নটবর বলে—না রে। আমার কিছুই হয় নি।

আজ তোদের ইস্‌পিশাল শো। মানী ব্যক্তিরা—সাহেব সুবোরা আসবেন। তোরা সব গোছগাছ করে টাইমে খেলা শুরু করবি। দলের নাম—

সৃষ্টিধর তা জানে।

বলে সে—ওসব ঠিক হয়ে যাবে কত্তা তোমার আশীর্বাদে। বুড়ো নটবর ওই কথায় বলে।

—আমি কে রে ? সব ত্যানার ইচ্ছে। সেই ঠাকুরের।

নাহলে আজ কে জানতো ছিষ্টি তুই এতবড় পুতুল নাচিয়ে হবি।

মন দিয়ে সাধনা করে বা।

বুড়ো হাঁপাচ্ছে।

তার সামনে কত আশা-ভরা রঙীন দিনের ছবিগুলো ফুটে ওঠে। আজ সব ম্লান, বিবর্ণ। সেই মেয়েটির কথা ভোলেনি।—পথে পথে ঘুরে মরা পুতুল নাচিয়ে কি পেলে ওস্তাদ!

সেও চেয়েছিল নটবরকে নিয়ে ঘর বাঁধতে। কিন্তু এই পুতুলের সংসারের নেশা কাটিয়ে নটবর ঘরে ফিরতে পারেনি। কে জানে সেই মেয়েটি কোথায় ?

এতবড় পৃথিবীর পথে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় দুজনে দুজনকে হারিয়ে ফেলেছে। শীতের দিন। বাগানের সবুজ পাতাগুলো হলুদ—লাল রং ধরেছে, দমকা বাতাসে খসে পড়ে বিবর্ণ পাতাগুলো।

নটবরের মনে হয় জীবনটাও অমনি। বসন্তের বাতাসে সাড়া জাগায়, গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্বলে পুড়ে বর্ষার সজল ধারায় গাঢ়তর হয়ে ওঠে যৌবনের বর্ণে—বাতাসে, জ্যোৎস্নায়, নাচে সুর তোলে বাতাসে।

আবার শীতের হিম হাওয়ায় জীর্ণ বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। হারিয়ে যায়। নটবরও তেমনি ঝরে পড়বে একদিন।

দিন এখন সৃষ্টিধরদের। সে হারিয়ে যাবে।

বেলা হয়ে আসছে।

ক্লান্ত মেলার নির্জন বিষণ্ণতা কেটে এবার জেগে উঠছে শীতের মধ্যাহ্নে নোতুন রূপে।

দোকানীরা বন্ধ ঝাঁপ খুলে দোকানে পশরা সাজিয়ে বসেছে, কলরব করে আসছে মেলার দর্শকরা, গরুর গাড়ির সার আসছে মেয়েদের নিয়ে শূন্য প্রান্তরে ধুলো উড়িয়ে। মাইকে গান বাজছে।

সার্কাস-এর বড় তাঁবুর চারপাশে লোকজন জমছে। আসছে দর্শকরা।

নটবর নিস্পৃহ দর্শকের মত দেখছে, মেলাটা যৌবনবতী নারীর মত রূপে-বর্ণে সেজে উঠেছে। লোকজন এসে জমছে।

পঞ্চা বলে।

—কত্তা! একবার দ্যাখো গে তাঁবুর ভেতরটা।

নটবর চাইল ওর কথায়। পঞ্চা বলে।

—পুতুল নাচ দেখতে এতো লোকজন ছেলেরা আসে তা দেখিনি বাবু। তাঁবু ভরে গেছে।

নটবর খুশি হয়—তাই নাকি রে! চল—

হাঁটতে ঠিক যেন পারে না। জীর্ণ শরীর।

তবু বুড়ো নটবর কি উৎসাহ নিয়ে চলেছে তাঁবুর ভিতরে।

মঞ্চের দুদিকে কলাগাছ—ঘট দিয়ে সাজানো। ভিতরের সতরঞ্চি পাতা ঠাঁইটা ভরে গেছে ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড়ে। পিছনে চেয়ারগুলোয় বসেছেন ডি. এম সাহেব, শিক্ষকরা কিছু কাগজের লোকজনও। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। মাইকে সানাই-এর সুর বাজে।

সৃষ্টিধরই নটবরকে নিয়ে গিয়ে ডি. এম সাহেবও অন্য সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

—ইনি নটবর পাল, দলের প্রতিষ্ঠাতা, আমার গুরু।

নটবর বলে—আপনারা এসেছেন আমাদের এখানে পুতুল নাচ দেখতে, কতবড় ভাগ্যি আমাদের। দেখুন—সবই এই ছিষ্টির হাতে গড়া। আমার বয়স হয়েছে তো ওইই খেলা দেখায়।

ডি এম. সাহেব দেখছেন ওদের দুজনকে, সারা তাঁবুটাও নজরে পড়ে তাঁর।

শিশু মেলা! ডি এম. সাহেবই মন্তব্য করেন।

এই মেলায় নিছক শিশুদের জন্যই এই অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতার আবৃত্তি শুরু হয়েছে। ছন্দে গানে ওরা গেয়ে চলেছে।

মঞ্চে দেখা যায় তালগাছে ঘেরা নির্জন প্রান্তর—পড়ন্ত রোদ, একটা পাল্কী চলেছে, পাশে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে ছোট একটি কিশোর পুতুল—হাতে তলোয়ার।

হিম্-ব্রো—হিম্-ব্রো! দুলে দুলে পাল্কী চলেছে নির্জন প্রান্তর দিয়ে। পুতুলের দল চলেছে।

মায়ের ভয় করে। ডাকাতের মাঠ!

তরুণ কিশোর পুতুল তরোয়াল দেখিয়ে সাহস দেয়! এমন সময় চিৎকার ওঠে—হারে রে রে!

পুতুলের ডাকাত দল এসে আক্রমণ করেছে, ইয়া গোঁফ, গালপাট্টা—বাবরি চুলে লাল ফেটি বাঁধা হাতে মস্ত লাঠি। একাই খোকন তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করছে।

মা ভয়ে কাঁটা!

হাততালির শব্দ ওঠে কচি হাতে—কবির গলায় ফোটে আনন্দের সুর।

বুড়ো নটবর দেখছে ওই দর্শকদের অকুণ্ঠ খুশির প্রকাশ। মনে হয় তার শিক্ষা সার্থক। এত বড় জয়ের স্বীকৃতি কোনদিনই তারা পায়নি। পুতুল দিয়ে এমন সহজ সুন্দর মনভোলানো অনুষ্ঠান করে করে সৃষ্টিধর, যেন নোতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে। নটবর কেন সকলেই মুগ্ধ হয়েছে।

আলাদিনের পালাও দারুণ জমে ওঠে।

হাজারো কচিগলায় কলরব ওঠে, আনন্দিত তারা। অনুষ্ঠানের পর স্বয়ং ডি. এমও সৃষ্টিধরকে ডেকে পাঠান।

ডি এম. সাহেব বলেন—আপনাকে কলকাতার অনুষ্ঠানে সুপারিশ করেছি। এবার আমি রেকমেণ্ড করবো দিল্লীর ন্যাশন্যাল প্রোগ্রামে—আপনি যেতে পারেন।

সৃষ্টিধর বলে—সামান্য মানুষ হুজুর। শিক্ষা-দীক্ষা আমার এঁর কাছেই, কিই বা জানি।

জীর্ণ নটবরের দিকে চাইলেন ডি. এম. সাহেব। মুখে কুঞ্চন রেখা জীর্ণ স্থবির নটবরকে দেখছেন তিনি। গ্রামীণ শিল্পীদের এই বোধ হয় শেষ পরিণতি।

দেখে মনে হয় খুব ভালোও নেই—কোনরকমে বেঁচে আছে মাত্র। যে মানুষ অতীতে মেলায় মেলায় বহুজনকে আনন্দ দিয়েছে আজ তার জীবনের শেষ লগ্নে সে রয়ে গেছে নিঃস্ব, বঞ্চিত। আজ ওর মুখে সেই হতাশার ক্লান্তি।

ডি. এম. সাহেব কি ভাবছেন!

বলেন তিনি।

—সৃষ্টিধরবাবু আপনার দিল্লীর অনুষ্ঠানের কথা নিয়ে চিঠি লিখছি। আর নটবরবাবুকে নিয়ে বৈকালে ওই অনুষ্ঠানে যাবেন কথা হবে।

বাচ্চার দল তখন ঘিরে ধরেছে নটবর-সৃষ্টিধরকে। ওরা বলে —পুতুলনাচ হবে না? শিয়াল আর বাঘের গল্প দেখাতে পারো?

ছেলের দল ঘিরে ধরেছে সৃষ্টিধর আর নটবরকে। ওদের চোখে কি বিস্ময়ের ঘোর।

কে শুধোয়—ওসব জীবন্ত, না দাদু?

নটবর দেখছে ওই কচি কাঁচাদের। এমন দর্শক কখনও এর আগে পায় নি নটবর। বুড়োর জীর্ণ দেহ-মনে আসে নোতুন এক স্বীকৃতি। আবার নিজে পুতুল বানিয়ে খেলা দেখাবে সে এদের জন্য।

নটবর বলে—জান্ত কেন হবে গো! ওরা সব নাচে হাতের ইশারায়। সামনের বার ওই বাঘ সিংহ, শিয়াল মামার পালাই দেখাবো।

সৃষ্টিধর দেখছে নটবরকে।

—ছেলেরা শুধোয় দেখাবে তো?

নটবর বলে—নিশ্চয়ই। কতো সুন্দর পালা আনবো এবার।

কলরব করেঁ খুশি হয়ে চলে যাচ্ছে ছেলের দল।

নটবরের শরীর মন যেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ওই কচিদের কলরবে, সান্নিধ্যে। জীর্ণ মুখে কি বিচিত্র এক তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে।

নটবর বলে—বাচ্চাদের জন্য আবার নোতুন পুতুল বানাবো, ছিষ্টি, ওই বাঘ, সিংহ, শিয়ালের পালা। যা হবে না—দেখবি নটবর ওস্তাদ আবার পালা নাচাবে—

সৃষ্টিধর দেখছে ওই বৃদ্ধকে।

বলে সে—বেশতো ওস্তাজ। আবার লাগাও নোতুন করে। চলো, ওবেলায় আবার মিটিং-এ যেতে হবে। ডি. এম. সাহেব মেলা কমিটি থেকে বলে গেছে।

নটবরের খেয়াল হয়—তাইতো রে। চল—

পুরস্কার বিতরণী সভায় লোকজন জমেছে। বিরাট প্যাণ্ডেল ভরে গেছে দর্শক আর লোকজনে। এগ্জিবিশনেও প্রাইজ দেওয়া হবে। চাষী—অন্য লোকরাও এসেছে।

ওদিকে বসে আছে সৃষ্টিধর—নটবর।

বাসিনী আসতেই চায়নি।

হেমন্তবালা—জনার্দন সেজেগুজে বাসিনীকে সঙ্গে করে এনেছে।

হেমন্তবালা বলে।

—ভদ্দরলোকের মত থাকবি। কতা বলবি না।

বাসিনী এসে ওই প্যাণ্ডেলের লোকজন দেখে ভয়ে চুপ করে গেছে। যে মেয়েটি আসরে এত লোকের সামনে নেচে-গেয়ে মাত করে, সেও চুপ করে বসে আছে কি অজানা ভয়ে।

মঞ্চে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে রবি সরাওগী সভাপতির আসনে। পাশে ডি. এম. ওদিকে এস. পি সাহেব। মতিবাবুও আছেন। তবে একদিকে।

আর বাদল ঘোষ ধুতি পাঞ্জাবির উপর জহর কোট পরে একেবারে

অন্য মূর্তি ধরেছে। বুকে হলুদ গোল ব্যাচ পরে মাতব্বরি করছে।

তার হাতেই সব নামের কাগজপত্র।

বাজারের গোলাব মাঝে মাঝে ছবি তোলে, মনোহারি দোকানের সঙ্গে তার ফটো স্টুডিও আছে একটা। গোলাবকে আজ বাদল ঘোষ পয়সা দিয়ে এনেছে। গোলাবও ফটাফট ছবি তুলে চলেছে।

রবি সরাওগী গলায় মালা সমেত ডি. এম. সাহেব আর ওদিকে এস. পি. সাহেবকে নিয়ে ছবি তুলছে। অবশ্য তাক্ বুঝে বাদল ঘোষও ঠিক ছবিতে এসে যাচ্ছে।

খোকন মিস্তির একদিকে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ঘোষ যেন তাকে এখন থেকেই না-পাত্তা করে দেবে।

রবি সরাওগী এবার ভাষণ দিতে উঠেছে। পতিত মাস্টারই ওর ভাষণটা লিখে দিয়েছে। কৃষির...উন্নতি আর তার উপরই সমাজের, দেশের উন্নতি নির্ভর করছে, সরকার এ ব্যাপারে এখানে সাহায্য করছেন। সাধারণকেও কোমর বেঁধে এই কৃষির কাজে এগিয়ে আসতে হবে, অধিক ফসল ফলাতে হবে ইত্যাদি অনেক সারগর্ভ রচনা থেকে পাঠ করে বসলো সরাওগী।

হাততালির শব্দ ওঠে।

ডি. এম. সাহেবও কিছু বলেন। বাদল ঘোষ ঘন ঘন হাততালি দিয়ে চলেছে।

খোকন মিস্তির গুম হয়ে বসে দেখছে মাত্র।

এরপর শুরু হয় কৃষিতে যারা প্রথম দ্বিতীয় হয়েছে তাদের আর লোক শিল্পীদের পুরস্কার দেবার পালা।

প্রাইজ নেবার জন্য গ্রামের চাষীরাও এসেছে। কিন্তু অবাক হয় তারা—সেরা বাঁধাকপি ফুলকপি উৎপাদনের জন্য প্রথম পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে বসন্ত দত্তকে!

চমকে ওঠে ইরফান। সেই চাষ করেছে, জমির মালিক অবশ্য বসন্তবাবু।

ইরফান চাপা স্বরে বলে ওঠে—অ মামু। ই কি রকম হোল। চষলাম, ফসল করলাম আমি! আর মেডেল লেবে বসন্তবাবু?

গোলমাল, গুঞ্জরণ ওঠে। জানতো বাদল ঘোষ এমনি গোলমাল হতে পারে। ফিঙেও দলবল নিয়ে তৈরি ছিল। তারা গর্জে ওঠে। ঈশ্বরও রয়েছে। বলে সে—চুপ করে বসুন! গোলমাল করবেন না।

ওরা ভয়েই থেমে গেল।

হাততালির মধ্যে বসন্তবাবু সেরা কৃষিবিদের পুরস্কার নেবার জন্য মাধব উঠেছে। অবশ্য তার আগে বাদলের বাড়িতে দু-বস্তা আলু পৌঁছে গেছে। বসন্তবাবু মঞ্চে উঠে গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দর্শকদের নমস্কার জানিয়ে নেমে গেল।

এবার উঠেছে নিমাই সাহা। সে নাকি সেরা আখ ফলিয়েছে। তারপর দেগাঁয়ের জোতদার অশ্বিনী লায়েক। লায়েক মশাই নাকি আলু বিশারদ—

পিছন থেকে গর্জে ওঠে তার চাষী নোটন।

—ই পেরাইজ কি দিচ্ছেন আজ্ঞা? ওরা হাল ধরে, না মাঠে যায়? ফসল করি আমরা মেডেল লিবেক উরা। চলো হে—এখানে আর নাই।

গোলমাল ওঠে আসরে।

ডি এম. সাহেবও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু করার কিছু নেই। কমিটি যা করছে তাই হচ্ছে। ওদিকে ফিঙের দল নেমে পড়েছে আসরে। গোলমাল থেমে আসে। ঈশ্বরও মাথা তুলে ঠাণ্ডা করে ওদের।

তবু একটু অশান্তি যেন থেকে যায় এদিক ওদিকে।

এবার লোকশিল্পী হিসাবে ডাকা হয়েছে বাসিনী দাসীকে।

বাসিনী একটু ঘাবড়ে যায়। এমন আসরে সে বড় একটা আসেনি। সে জানে তার ঝুমরির আসর। সেখানে রং ছোটাতে পারে সে। ভয় ভয় করে তার। পাশে বসেছিল ওই সৃষ্টিধর।

সৃষ্টিধরই ভরসা দেয় তাকে—ভয় কি, যাও। প্রাইজটা নিয়ে নমস্কার করে নামবে।

হেমন্তবালাও তাড়া দেয়—যা না লা।

ভয়ে ভয়ে উঠে গেল বাসিনী মঞ্চে। ওই রবি সরাওগী, বাদল ঘোষ, নিমাই সাহার মত লোকগুলোর প্রকৃত স্বরূপ সে চেনে, ওদের জন্যে নয়—ভয় করে তার ওই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর ওই মানুষদের, ওদের মাঝে সত্যিকার অনেক গুণী-জ্ঞানী মানুষ আছেন। বাসিনী ভক্তিভরে প্রণাম জানায় ওদের।

রবি সরাওগী দেখছে তাকে কি যেন লুব্ধ চাহনি মেলে। বাদল ঘোষ যেন তাকে এই সম্মান পাইয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে সেও কিছু পেতে চায় এমনি ভাব নিয়ে চেয়ে আছে। বাসিনী নেমে এল মঞ্চ থেকে।

এর পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে থেকেই ঘোষণা করেন।

—আর একজন প্রকৃত শিল্পীকে আমি সরকারের তরফ থেকে সম্মানিত করতে চাই। তিনি পুতুল নাচের অন্যতম প্রবর্তক—শ্রীনটবর দাস। নটবরবাবুকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি।

বাদল ঘোষ ডি-এম সাহেবকে কি বলতে যায়। ডি-এম সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—এটা আপনাদের ব্যাপার নয়। সরকার পক্ষ থেকে বলছি।

নটবর জীবনে এ সম্মান পায় নি। প্রত্যাশাও করে নি, আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই স্বীকৃতি তার চোখে জল এনেছে।

ছেলের দল—শিক্ষক—নটবরের পুতুল নাচের অনেক দর্শকই ছিল এখানে। তারা আনন্দে হাততালি দিয়ে শিল্পীকে সম্মানিত করে।

বৃদ্ধ নটবর এগিয়ে যায়।

মঞ্চে উঠতে করতালির শব্দ ওঠে। নেমে আসছে সে।

সৃষ্টিধর সত্যিই যোগ্য শিষ্য ওর। আজ সেই ধারাকে সৃষ্টিধর

বাঁচিয়ে রেখেছে সগৌরবে। মঞ্চের এদিকে এসে নটবর হঠাৎ সামনে কাকে দেখে অবাক হয়।

—তুমি, হেমন্ত!

হেমন্তবালাও এগিয়ে আসে। সে দেখছে অতীতের সেই যুবকটিকে —আজ সে বৃদ্ধ, অসুস্থ, জীর্ণ। হেমন্তবালারও যৌবনের শ্রী-লালিত্য নেই। আজ বয়সের ভারে সেও নুয়ে পড়েছে। বহুদিন পর দু'জনে দেখেছে দু'জনকে।

হেমন্তবালা বলে—চিনেছো তাহলে মাস্টার।

প্রণাম করে সে।

নটবর দেখছে তার যৌবনের সেই মানসীকে। আজ দু'জনেই যেন এ জগতের হিসাবের বাইরে।

বৈকালের আলো ম্লান হয়ে সন্ধ্যা নামছে।

বৃদ্ধ নটবর ফিরছে তার তাঁবুর দিকে, সঙ্গে রয়েছে হেমন্তবালা।

শীতের দমকা হাওয়ায় বিবর্ণ পাতা ঝরছে, বাতাসে তাদের উড়ে যাবার শব্দ ওঠে।

শস্যরিক্ত উদাস দিগন্ত জুড়ে নামছে দিন শেষের বিষণ্ণতা।

—মাস্টার!

নটবর চাইল হেমন্তবালার দিকে।

হেমন্ত বলে—কতো দিন পর দেখা! ভেবেছিলাম ঘর বেঁধে এখন কোথায় সুখে শান্তিতে রয়েছো? তা নয়, পথে পথেই ঘুরে জীবনটা শেষ করে দিলে ওস্তাদ!

নটবর যেন হারানো সেই দিনগুলোকে ফিরে পেয়েছে। বলে সে—সেদিন তো ঘর বাঁধতেই চেয়েছিলাম হেমন্ত, তুমিই ফিরিয়ে দিলে। আজ এসেছো কেন পথে পথে ঘুরছি তার হিসেব নিতে?

হেমন্তবালা জবাব দিল না।

আজ মনে হয় সেও ভুল করেছে। সেদিন কি নেশার জগতে

নিজেকে হারিয়েছিল, তুচ্ছ করেছিল একটি মানুষের ভালোবাসা, তার ঘর বাঁধার আমন্ত্রণকে।

আজও সে নিঃস্ব হয়েই পথে পথে ঘুরছে ক্লান্ত, শূন্য জীবনের বোঝা বয়ে। হেমন্ত বলে।

—ভুল করেছিলাম মাস্টার। সেদিন ভাবিনি জীবন এত শূন্য হতে পারে। আজও তাই পথে পথেই ঘুরে ফিরছি। কোন আশ্রয় নাই, আশ্বাস নাই গো।

হাসে নটবর। মলিন বিষণ্ণ সেই হাসি। বলে সে ম্লান দিগন্তপানে চেয়ে—দিন তো শেষ হয়ে এল হেমন্ত, তবে আর বৃথা দুঃখ করে লাভ কি? একে মেনে নিয়েই শূন্য হাতে ফিরে যাবো।

হয়তো তাই।

হেমন্তের দিনও ফুরিয়ে আসছে। নটবর বলে।

—তবু বলবো অনেক পেয়েছি হেমন্ত। কতো লোকের মুখে হাসি ফুটিয়েছি। পুতুলের সংসারের কত্তা হয়ে নিজেই না হয় দুনিয়ার মঞ্চে পুতুল হয়ে নেচে গেলাম।

হেমন্ত চেয়ে থাকে নটবরের দিকে। বলে সে।

—এ তো সব শূন্যি গো!

হাসছে নটবর। ওর হাসিতে সেই শূন্যতার বেদনাই ফুটে ওঠে।

ক্লান্ত মানুষটা এগিয়ে চলে, শরীরটা আবার বেজুত লাগছে তার।

সন্ধ্যা নামছে।

নটবরকে বলে হেমন্ত—শরীর যা খারাপ তাতে আর ঘুরো না মাস্টার। এইবার দল থেকে ছুটি নাও তবু শান্তিতে শেষ ক'টা দিন কাটাতে পারবে।

ঘরের ঠিকানা যেন খুঁজছে আজ নটবর দাস। কিন্তু সে-ঘর কবে পিছনে ফেলে এসেছে। হেমন্তবালাও তা জানে। ছুটি! ছুটি নিয়ে যাবার জায়গা তার নেই।

তাঁবুর পিছনের একটু জায়গায় নটবরের শয্যা পাতা। চারিদিকে

জড় করা হয়েছে রকমারি পুতুল। হেমন্তবালাও এসেছে ওর সঙ্গে। দেখছে সেই অতীতের মানুষটাকে। পরিবেশ এতটুকু বদলায় নি। বদলে গেছে তারা দু'জনে।

নটবরের চোখের সামনে ফুটে ওঠে সবুজ স্নিগ্ধ সেই স্মৃতি।

হেমন্ত বলে—আজ চলি মাস্টার। ওষুধ-পত্তর খাও। কাল খবর নেব।

হাসে নটবর।

সৃষ্টিধর দেখেছে নটবর আর হেমন্তবালাকে কথা কইতে। মেলায় মেলায় এতদিন ঘুরেছে দু'জনে দল নিয়ে, তাই চেনা জানা হয়তো রয়েছে।

নটবর সৃষ্টিধরকে বলে—তুই এখানে থেকে মিটিন শেষ করে আয় ছিষ্টিধর। শরীরটা ভালো লাগছে না আমি বাসায় যেছি।

সৃষ্টিধর শুধোয়—একা যেতে পারবে তো?

হেমন্তবালা জবাব দেয় আমিও যেছি ওদিকে, নাহয় তোমার কত্তাকে বাসায় থুয়ে যাবো।

ওরা দু'জনে এগিয়ে যায়।

সৃষ্টিধর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদিকে প্রাইজ বিলি করার পালা চুকে গেছে। এবাব বাদল ঘোষ নিজে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গদ্গদ ভাষায় ধন্যবাদ দিয়ে চলেছে। আরও কি সব বড় বড় কথাটথাও বলছে।

—ধ্যাৎ শ্লা। যতোসব মিছে কথা মাইরী!

সৃষ্টিধর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর ধারালো হাসির শব্দে চাইল। মেয়েটি বের হয়ে আসছে ওই লোকজনের ভিড় ঠেলে। পরনে গোলাবী শাড়ি—নিটোল দেহ, যৌবনের বানকে যেন শাড়ি জামার বাঁধনে রুখেছে দামাল মেয়েটা।

সৃষ্টিধরকে দেখে দাঁড়ালো বাসিনী।

—তুমি। তা তোমার ওস্তাজকে দেখলাম মাসীর সাথে চলে

গেল! তাই বুঝি মা মরা বাছুরের মত একা পড়ে আছো ইখানে?

সৃষ্টিধর চাইল ওর দিকে।

বলে সে—একা কেন দাঁড়িয়ে থাকবো?

—তবে? বাসিনীর দু'চোখে হাসির ঝিলিক।

হাসে সৃষ্টিধর—তোমার জন্যেই তো পথ চেয়ে আছি গো!

—তাই নাকি!

হাসছে বাসিনী।

লোকজন কলরব করে চলেছে। সন্ধ্যা নামছে।

মেলার কলরব শুরু হয়। এদিকে সাহেব সুবোদের বিদায় জানাতে তাবৎ লোকজন ভেঙে পড়েছে।

রবি সরাওগী, বাদল ঘোষ ভিড় ঠেলে সাহেবদের শেষ বিদায় জানাতে চলেছে গাড়ি অবধি।

বাসিনী দেখছে ওদের ব্যাকুলতা।

বাসিনী বলে—মেলা খেলা—এই মিটিং ফিটিং শেষ মতলবটা কি জানো মাস্টার?

সৃষ্টিধর এত তলিয়ে দেখে না।

তাই শুধোয় বাসিনীকে।

—কি গো?

বাসিনী বলে—সব শ্লা ঘেয়ো কুকুরের দল মতলবে ঘুরছে! কে ক্যামন করে একটু গুছিয়ে নিতে পারে।

তাই দেখছে সৃষ্টিধর।

বাসিনী এই জগতের অনেক কিছুই দেখেছে। বলে সে।

—শ্লাদের ঢ্যামনামি দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় মাইরী। চলো মাস্টার ভিড় থেকে একটু ফারাকে চলো দিকি। একটুন বসে দুটো কথা বলি।

ওরা মেলার কলরবের বাইরে ছায়া নামা মাঠের পথ দিয়ে চলেছে। ওদিকে মাঠগড়ানি জলের কাঁদর, ওটাকে কাটিয়ে গভীর করে

ঝিলের মত করা, ধারে কিছু পুরোনো আমলের গাছ-গাছালিও রয়েছে।

একপাশে ঘাটলা বাঁধানো।

অতীতে বেশ সাজানো ছিল জায়গাটা, জমিদার বাবুদের রমরমার সময়, এখন মেরামত অভাবে ফেটে গেছে চাতালটা।

ওর উপরই বসলো বাসিনী।

সামনে ঝিলের জলে সন্ধ্যা আকাশের দু'চারটে তারার আভা জাগে। আশপাশের মাঠে সবুজ ছোলা—গমের বুকে আগত সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে ওঠে।

এদিকটায় লোক চলাচল নেই। নির্জন।

বাসিনী বলে—বসো মাস্টার! সেই বৈরাগীতলার পর আবার এখানে দেখলাম। এখন তো তোমার খুব নাম ডাক হে। ভালো বায়না। সৃষ্টিধর বলে।

—কই আর তেমন বায়না। খাজনা থেকে বাজনাই বেশী। হাসে বাসিনী—না বাপু। শহরের কত্তারা মান্যি করে, কত লোক খাতির করে।

সৃষ্টিধর বলে—তুমিও কম কিসে গো। তোমার নাচগানের সুখ্যাতির জন্যই তো শহরের কত্তারা ডেকে নে গিয়ে কত লোকের সামনে মেডেল দিল!

হাসে বাসিনী।

মলিন বিষণ্ণ কি বেদনার্ত সেই হাসি।

কথাটা বাসিনীও ভেবেছে। মাঝে মাঝে এমনি সব কথা ভাবে সে।

দেখেছে চারিদিকে, এই মেলাতেও কত লোকজন পরিবার ছেলে মেয়েদের নিয়ে গরুর গাড়িতে করে আসে। সেই ঘরের বৌদেরও দেখেছে।

অনেক অভাব কষ্ট আছে, তবু কোথায় তাদের জন্য একটু নিশ্চিন্ত

আশ্রয়, কিছু আশ্বাস—ভালোবাসা আছে। একজনকে ভালোবেসে তারা সামান্য নিয়েই সুখী হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে।

আর বাসিনী দেখেছে তাদের তুলনায় তার নিজের জীবন ভোর এই শূন্যতা আর ব্যর্থতার বেদনাকেই।

সারা মন সেই হাহাকারে ভরে উঠেছে।

কিছুই সঞ্চয় তার নেই, আছে শুধু গ্লানি আর দুঃসহ বেদনাই। স্বষ্টিধর দেখছে ওকে।

—কি হল? চুপ করে গেলে যে?

বাসিনী চাইল ওর দিকে। এ সেই রহস্যময়ী চঞ্চলা মেয়ে নয়, দু'চোখে নিবিড় বেদনার আভাস। অবাক হয় স্বষ্টিধর। এদেরও বেদনার প্রকাশ আছে?

বাসিনী বলে—তুমিও ওই মেডেল আর আসরের হাততালির মোহে বাঁধা পড়ে গেছো ওস্তাজ, তোমার গুরু ওই বুড়ো নটবর পাল মাশায়ের মতই, না?

স্বষ্টিধর চাইল ওর দিকে।

নিজের জীবনটাকে নিয়ে কোনদিন ভাবেনি স্বষ্টিধর। নটবরকে দেখেছে পুতুলের সংসার, তাদের হাসিকান্নার পালায় ডুবে থাকতে। আজ বাসিনী তাকে সেই ঘর বাঁধার প্রশ্নই করেছে। স্বষ্টিধর বলে।

—কেন এই বা মন্দ কি? বেশ তো আছি?

হাসে বাসিনী।

—এই তোমার বেশ থাকা ওস্তাজ? ঘর নাই—কেউ নাই, আপনজন নাই, পথে পথে ঘুরছো কি নেশায়, আর সেই নেশার ঘোরকে ঢাকবার জন্য বলো বেশ আছি?

স্বষ্টিধর বলে—তুমিও তো এই পথের জীবনকেই মেনে নিয়েছো। তবে এটাকে খারাপ বলো কেনে?

বাসিনী বলে ওঠে—না। ওস্তাজ! পথ পাইনি গো। ঠিকানা যে হারিয়ে গেছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বাসিনীর দুচোখে জল।

সৃষ্টিধর চুপ করে আছে।

বাসিনী বলে।

—তুমিও কি গুরুর মতই পথে পথেই ঘুরবে মাস্টার? তোমার তো অনেক নাম ডাক—কলকাতা দিল্লীতে যাবে খেলা দেখাতে। তোমার পথ আলাদা, কিন্তু আমাদের কি হবে বলতে পারো? এমনি করে নেচে-গেয়ে রূপ-যৌবন বেচে যেদিন ফৌত হয়ে যাবো, সেদিন এমনি কোন মেলাতেই পচে-মরে ফুরিয়ে যাবো মাস্টার। কেউ চিনবে না—কি এর দাম বলতে পারো, এই মেডেলের? এই পথে পথে ঘোরার? ওই হাততালির।

সৃষ্টিধর এর জবাব দিতে পারে না। তবু বলে সে।

—শিল্পীর জীবন কষ্টের জীবন বাসিনী।

বাসিনী বলে—কিন্তু এ জীবন আমি চাই নি মাস্টার। শিল্পীর জীবনে আমার লোভ নাই। এ জ্বালা আর সয় না। আমিও চেয়েছিলাম একজনকে ভালোবেসে ঘর বাঁধতে।

চুপ করে থাকে সৃষ্টিধর। রাত্রি নামছে।

—আজ চলি বাসিনী। আবার শো আছে। চলে গেল সৃষ্টিধর।

বাসিনী জবাব দিল না। তাদেরও আসর পড়বে এইবার। আজ যেন বাসিনীর মন-মেজাজ বিগড়ে গেছে।

ওই হেমন্তবালার জীবনের ব্যর্থতাটা তার চোখ এড়ায় নি। হেমন্তবালাও এমনি পথে পথেই মরবে, মরতে হবে তাকেও। হয়তো জীর্ণ স্থবির ওই নটবরকেও।

বাসিনী একাই বসে আছে ঘাটলায়। ওদিকে মেলার হৈ-চৈ শুরু হয়েছে।

আলো জ্বলে ওঠে সার্কাসের তাঁবুতে, সিনেমার তাঁবুও মুখর হয়ে

উঠেছে। দোকান-পসারে লোক জমেছে। মেঠো সরান—আল-পথ দিয়ে আসছে হাজারো মানুষ, গরুর গাড়ির সারি।

—বাসিনী! আরে তুমি এখানে?

বাসিনী চাইল বাদল ঘোষকে দেখে। একটু গম্ভীর হয়ে যায় বাসিনী।

বাদল ঘোষ বলে—তোমাকেই খুঁজছি! বাসাতে গেছলাম—বললে ফেরোনি। এখানে কি করছো?

বাসিনী বলে—বসে আছি।

বাদল ঘোষ ভূমিকা না করে বলে।

—আগামই ভালো বাপু! একশো এক টাকা বায়না, আজ রাতে রবি সরাওগীর বাগানে একটু নাচ-গান হবে। অনেকে থাকবেন। আর তুমি প্রাইজ পেয়েছো শুনে রবিজী খুব খুশি হয়ে বললেন—ওকে একটু খাওয়ানো দরকার। তোমার মাসীকেও বলেছি। তোমাকে খুঁজে নে যেতে বল্লে।

বাসিনী দেখছে মানুষটাকে। ওদের চেনে সে।

বাদল ঘোষ বলে—মস্ত লোক রবি সরাওগা। আর সমঝদার লোক।

বাসিনী বলে ওঠে—আজ যাবো না। ওখানে নাচবো না। বায়নার টাকা ফেবত নিয়ে যান।

—সেকি! চমকে ওঠে বাদল ঘোষ। বলে সে মেয়েটাকে দেখছে। বাদল ঘোষ আজ একটু জমিয়ে মজা করার জন্য রবি সরাওগীকে রাজী করিয়েছে এই মুজরায়, আর মেয়েটা সব ভেস্তে দেবে। বাদল বলে—কথা দিয়েছি। ওদিকে সব আয়োজনও হয়ে গেছে।

বাসিনী উঠে পড়ে। বলে সে—বললাম তো যাবো না। যান দিকি।

বাদল ঘোষ এবার বেশ চটে উঠেছে। শুধোয় সে।

—কেন? মতিবাবুর বাঁধা মেয়েছেলে তুমি যে উনি বললে যাবে,

আর কেউ বললে যাবে না? জানো তোমাকে প্রাইজ দিয়েছি আমিই। আমার কথা রাখতেই হবে।

বাসিনী এবার ফুঁসে ওঠে।

—আমাকে প্রাইজ দিয়েছেন আপনি? আপনি এত বড় কেউকেটা তা জানতাম না। যেখানে আপনার মত লোকের বিচারে প্রাইজ দেওয়ানো হয় সে প্রাইজ আমি নিই না। এই রইল আপনার মেডেল, বাসিনীর ওতে দরকার নাই। লাও হে—

বাসিনী ফিতে বাঁধা মেডেলটা বাদল ঘোষের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন্ করে চলে গেল।

•

মতিবাবু মেলার মিটিং-এ এসেছিলেন। দেখেছেন সব। খোকন মিত্তিরও সঙ্গে রয়েছে। মেলার অফিসেও এসে বসেন। আজ রবি সরাওগীই যেন নেতা। বাদল ঘোষের দলও ঘুরছে মেলায়। খোকন মিত্তির সব দেখে শুনে এবার এসে বসেছে মেলার অফিসে। আদায়-পত্রের হিসেব করতে হবে এবার।

মতিবাবুই কথাটা আজ সন্ধ্যায় জানান কমিটিকে। রবি সরাওগীও অবাক হয় কথাটা শুনে।

মতিবাবু বলেন—মেলার জায়গা সবই আমাদের দেবোত্তরের। সেবা চলে এর আয়পয় থেকেই। তাই মেলার আমদানি পত্রের হিসাব চাই, আমাকেও দেবোত্তরে হিসাব দিতে হবে। গত সনের আদায় ছিল পনেরো হাজার টাকা। সেই হারে আদায় দিতে হবে এবারও। জানেন তো হিসাবের টাকা—এটা চাই!

চমকে ওঠে বাদল ঘোষ।

—তাই নাকি?

মতিবাবু বলেন।

—হিসাব দেখো, আর ওই টাকা আদায় না পেলে দেবোত্তর এস্টেট কমিটির নামেই স্বার্থহানি—অর্থ তছরূপের মামলাই রুজু করতে

পারে। চলি রবিবাবু পরে এটা কি করবেন জানাবেন। আমার জানার দরকার।

মতিবাবু ইটটি ছুঁড়ে বের হয়ে গেলেন। নিমাই সাহা গর্জাচ্ছে—মামলা করবে ?

বাদল ঘোষ বলে—কিছু বলুন সরাওগীজী।

রবি সরাওগী আইন বোঝে। মতিবাবু আইনের কথাই বলেছেন। এবার বিপদেই পড়েছে সে। রবি সরাওগী বলে।

—এসব বাত আগে কাহে বলোনি বাদল! এখন কি হবে ? আইনের বাতই বলেছেন মতিবাবু। মুশকিল হবে এ নিয়ে।

রবি সরাওগী ভাবনায় পড়েছে। এত আদায়পত্র হবে না এই মেলার জায়গা ভাড়া দিয়ে এটা বুঝেছে বাদল ঘোষ, রবিবাবুও। মতিবাবু -ইচ্ছা করেই ওদের বিপদে ফেলে জব্দ করার জন্যই এক কথায় প্রেসিডেন্টগিরি ছেড়ে দিয়ে এবার অন্যপথে ঠেসে ধরেছে।

নিমাই সাহা বলে ওসব হিসাব ফিসেব ঢের বুঝি! খোকন মিত্তির অমন ভাবে মিথ্যে হিসাব দেখিয়ে খাতাপত্র তৈরি করে আমাদের কমিটিকে বিপদে ফেলতে চায়।

রবি সরাওগী এবার বাদল ঘোষ, নিমাই—মতিবাবুদের উপরই চটে উঠেছে। বেশ ছিল সে।

ব্যবসাপত্র করে, রাতের অন্ধকারে মাল পাচার করে কিছু পয়সা রোজগার করছিল, এদের পাল্লায় পড়ে ওই প্রেসিডেন্ট সাজতে গিয়ে এবার মামলা—মোকদ্দমায় পড়তে হবে খেসারতের দায়ে একথা ভাবে নি।

এখন রেগে উঠেছে তাই রবি সরাওগী।

বলে সে—তোমরা এসব বুঝে নাও, বাদলবাবু আমি এসবে নেই।

বাদল ঘোষ বিপদে পড়েছে।

তবু বলে সে—ওসব বাজে কথায় কান দেবেন না রবিবাবু, আমি সব ঠিক করে দেব। আজ—

রবিবাবুর রাগ পড়ে না এত সহজে।

বাদলের কথায় ঘটনাটা মনে পড়ে। আজ রাতে তার বাগানে নাচ গানের আয়োজনের কথা ছিল। ওই মিটিং এর পর খুশি হয়েই রবিবাবু মত দিয়েছিল বাদলের কথায়। নাম ডাক হতে গেলে এমন এক আধটু বাজে খর্চা করতে হবে। আর সেই নাচনেওয়ালী মেয়েটাকে দেখে রবি সরাওগীর ব্যবসায়ী মনের পাথরটাও একটু যেন চিড় খেয়েছিল।

এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে।

রবি সরাওগীর মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। টাকা—মামলা—খেসারত এসবে সে নেই। তার কারবারের খাতায় লোকসান বলে কিছু নেই।

আজ রবি সরাওগী বাদল ঘোষের কথায় বলে—আরে উ নাচা গানা ছাড়ো তো ? ওসব ঝুট ঝামেলা হটাও বাদলবাবু। নেহি হোগা উসব।

বাদল ঘোষ রবি সরাওগীর এই কথায় মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়। নাহলে তার প্রেলেম ধরা পড়ে যেতো।

নাচেনেওয়ালী মেয়েটা মোটেই রাজী হয় নি এই মুজরোতে। ওদের দলের মালিক হেমন্তবালাকেও গিয়ে বলেছিল বাদল ঘোষ। যদি সে বলে কয়ে বাসিনীকে রাজী করাতে পারে।

কিন্তু হেমন্তবালা বলে।

—বাবা নাচবে ওই বাসিনী, ও যদি রাজী না হয় আমি কি করে বলবো।

অর্থাৎ ওই মোটা মেয়েটাও তাকে এড়িয়ে গেছে। বেশ বুঝেছে বাদল যে এসব মতিবাবু, খোকন মিত্তিরেরই কাজ। ওরা ওকে নিষেধ করেছে।

গুম হয়ে ফিরেছিল বাদল।

এখানে এসে রবি সরাওগীর কথা শুনে আরও চটে গেছে মতিবাবুদের উপর।

আর রবি সরাওগী ওই নাচের ব্যাপার নাকচ করে দিতেই বাদলের উর্বর মস্তিষ্কে কথাটা এসে পড়ে। সেও সুযোগ বুঝে বলে।

—কিন্তু আয়োজন এগিয়ে গেছে রবিজী। মদের খর্চা হয়ে গেছে বায়না বাবদ শ' দুই টাকা আর মেয়েটাকে বায়না দিইছি একশো টাকা, ফুলটুল—চপ কাটলেটের জন্য কিছু গেছে।

রবি সরাওগী ব্যবসা বোঝে।

সে হিসাব করে নেয় নিদেন আট ন শো টাকা বাজে খর্চা হবে এই রাতে ওই নাচের ব্যাপারে, তবু কিছু দিয়ে সেই খর্চাটা বাঁচাতে চায় সে।

পকেট থেকে শো চারেক টাকা বের করে দিয়ে বলে।

—এই নিয়ে যাহোক করে মিটিয়ে দাও। নাচ হোগা নেহি। আর মতিবাবুদের ভি বালা—হম্ প্রেসিডেন্ নেহি হোগা। কভি নেহি হোগা!

বাদল ঘোষ টাকাটা নিয়ে গজরায়।

—শ্লা ব্যবসাই করগে, ইজ্জতের কি বুঝিস রে? এ্যা! মুরগীর কলজে নিয়ে পেসিডেন হবে? ছ্যা!

গজগজ করে আর ছিটোনো টাকাগুলো গুনে গুনে কুড়োতে থাকে। নগদ লাভ তার এই টাকাগুলোই! এর বেশী আর ওকে ধ্বসানো গেল না।

মতিবাবু শেষ অবধি বেশ জব্বর চাল দিয়েছে।

খোকন মিত্তির বলে—এবার বুঝবে রবি সরাওগী। শোনলাম বাদল ঘোষকে তুলো ধোনা করছে।

হাসে মতিবাবু।

আজ ওদের মাথা তোলার উচিত জবাব দিয়েছে সে।

আরও জবাব দেবে।

মতিবাবুর আজ জমিদারী নেই। সরকার সব দখল করে নিয়েছে। কিন্তু জমিদারীর সেই কূট বুদ্ধিটাকে নিতে পারে নি।

সেটা রয়ে গেছে। আর জানে মতিবাবু শত্রুকে বাড়তে দিতে নেই।

একবার কাতে ফেলেছে, এবার আরও জোরে ঘা মারতে হবে যাতে কোনদিন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। আর তার বিরুদ্ধে দল বাঁধতে না পারে।

রবি সরাওগীকে আর একটা ঘা মেরে জানান দেবে মতিবাবু, যে সে এখনও মরেনি তাকে হঠাতে পারবে না সরাওগী। মতিবাবু বলে।

—খোকন, তোর নদেরচাঁদ তার দলবল ঠিক আছে তো? খোকন মিত্তির এগিয়ে আসে।

—হ্যাঁ। কত্তাবাবু!

খোকন তাদের বলে কয়ে তৈরি করে রেখেছিল। সেজবাবুর কথায় বলে—তাহলে ওদের বলি!

মতিবাবু কি ভেবে বলে।

—তাই যা। তবে যেন হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করে। তেমন তেমন কিছু ঘটে গেলে যেন না-পাত্তা হয়ে যায় কিছু দিনের জন্যে। বুঝলি!

খোকন মিত্তির এসব বেশ ভালো ভাবেই বোঝে। চলে গেল সে।

ঈশ্বর আজ তৈরি হয়ে এসেছে। কাল রাতে মেয়েটার কাছে হেরে যাবার পর নিজেকে তৈরি করেছে সে। কোনমতেই আর আজ বেচাল হবে না। গুপী বদনদের বলে।

—মেয়েটাকে আজ ভিড়তে দিবি না ছকের কাছে।

গুপীও চতুর হয়ে গেছে। ওস্তাদের কাল মতিগতি দেখে সে ঘাবড়ে গেছল। আজ গুপী বলে—না!

ঈশ্বর বাবার নাম নিয়ে আসন বন্দনা করে আজ ছক পেতেছে, হাতও এসে গেছে। দানের পর দানে তার আমদানি হচ্ছে মোটা টাকা।

খেলা চলেছে আজ বেশ জোরে। ঈশ্বরও বসেছে আজ নিবিষ্ট

হয়ে। কালকের সেই মেয়েটিকে ভিড়তেই দেবে না গুপী। খদ্দেরের ভিড় জমেছে।

দারুণ দান পড়ছে ছকে।

ভজন হেঁকে চলেছে গলা চড়িয়ে—লাক টেরাই! ধর্মের দান—হরতন, চিড়িতন—নওলা। আসুন বাবু!

নোট যেন উড়ছে এখানের বাতাসে।

মশগুল হয়ে খেলছে ওরা। শীতের রাত হিম-গুঁড়ি কুয়াশা নামে—আলোর আভা ওঠে সার্কাসের তাঁবুতে। লোকজন জমেছে।

হঠাৎ আজ ওই আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে আমতলায় কারা হানা দেয় জুয়ার ছকে।

কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, দান পড়া নিয়ে।

কে একজন গর্জে ওঠে।

—শালা ঈশ্বর চোর, ঘুঁটি মারে! খবরদার!

গুপীও হেঁকে ওঠে। ঘুঁটি মারে কোন শালা? যে একথা বলবে তার জিব ছিঁড়ে নেব। শালারা।

গুপীও এবার চড়াও হয়েছে।

বারুদের স্তূপে যেন আগুন লাগে। লোকগুলো এমনিভাবে চড়াও হবার জন্যই সুযোগ খুঁজছিল। এবার সেটা মিলে যেতে লাফ দিয়ে পড়েছে।

ভজন চিৎকাব করে—ওস্তাজ! হুঁশিয়ার। ওস্তাজ। গুপী।

লুটপাট হাঙ্গামা যে হয় না তা নয়, আর জুয়ার আসরে লুটপাটের প্রধান লক্ষ্য ওই তহবিল। টাকার থলিটা বুকের নিচে ধরেছে ঈশ্বর।

গ্যাসের আলো দুটো নিভে গেছে। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির দল এলোপাথাড়ি আক্রমণ শুরু করেছে ওদেব উপর। ছিটকে পড়ে ঈশ্বর।

নন্তু অবশ্য সামনে আসেনি। ব্যবস্থাটা সেই করেছে খোকন মিত্তিরের সাহায্যে। ভিন গাঁয়ের বেশ কিছু লোককে লেলিয়ে দিয়েছে ঈশ্বর-গুপীদের ওপর।

কাল রাতে ওকেও মেরেছিল গুপী। আর খোকন মিত্তির জানে ঘা দিতে হবে বাদল ঘোষদের। তাই এ সুযোগ ছাড়ে নি। মেলার অপবাদ হবে। কিন্তু এটা করা দরকার। তাই এ আক্রমণ ঘটছে অতর্কিতে জুয়াখেলা নিয়ে।

চিৎকার ওঠে, গুপী ছিটকে পড়ে, ভজন সাবধানী লোক। সে আগেই দৌড়েছে। মার মার শব্দ ওঠে।

দু'-একটা বোমও ফাটছে।

দোকান-পসার বন্ধ হয়ে যায়। লোকজন ছুটোছুটি করছে।

ওই ফাঁকে ঈশ্বরও দৌড়চ্ছে তহবিল নিয়ে। নিরস্ত্র সে—মশগুল হয়েছিল খেলায়। তাই সে ভাবতে পারেনি। না হলে লড়তো সে-ও। ঈশ্বরও এসব বিষয়ে মজবুত, কিন্তু সময় নেই।

পিছনে দৌড়ে আসছে কয়েকজন—পিছন থেকেই কে এক ঘা লাঠি বসিয়েছে ঈশ্বরকে—পায়েও মেরেছে একটা লাঠি, ছিটকে পড়ে ঈশ্বর।

প্রাণেই মেরে ফেলবে বোধহয় তাকে। লোকগুলো আহত ঈশ্বরের উপর এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাথাটায় রক্ত ঝরছে। পালাবার চেষ্টা করে ঈশ্বর। কিন্তু ওরা তাকে ছাড়বে না। হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় আসে তার।

ঈশ্বর তহবিলের কাঁচা টাকা-পয়সা ওই হিংস্র লোকগুলোর সামনে ছিটিয়ে দিয়েছে। লোকগুলো লাফিয়ে পড়ে ওই টাকার উপরই।

সেই ফাঁকে ঈশ্বর ওই আহত রক্তাক্ত অবস্থাতেই দৌড়তে থাকে অন্ধকারে।

মেলার ভিড় এদিকে কিছুটা কম।

সারবন্দী ঘরগুলোয় দু একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

ঈশ্বর আহত অবস্থাতেই ওই একটা ঘরের সামনে গিয়ে ছিটকে পড়লো। রক্ত ঝরছে। ওঠার ক্ষমতা নেই।

—কে? কে গা! দ্যাখো আবার মাল খেয়ে কোন মাতাল এসে জমা হল। অ-মাসী!

বের হয়ে আসে বাসিনী।

ওর মন-মেজাজ ভালো নেই। এমনিই ফিরে এসে আর নাচের আসরে যায় নি বাসিনী। হেমন্তবালাও চাপ দেয় নি আজ। তবু দলের নাম রেখেছে সে।

হেমন্ত বলে—মাল-ফাল খাস নি। চুপ-চাপ শুয়ে থাক। একটু জিরোলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বাসিনী শুয়েই ছিল।

বাইরের ওই শব্দটা শুনে বের হয়ে এল সে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। কে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে।

হ্যারিকেনটা বাইরে এনে লোকটাকে দেখে চমকে ওঠে বাসিনী। কালকের সেই জুয়াড়ী। বাসিনী অবাক হয়—ওমা! তুমি এখানে? এই হাল কে করলো তোমার? কপালময় রক্ত।

ঈশ্বর বাসিনীকে ইশারায় চুপ করতে বলে।

বাসিনীও ব্যাপারটা বুঝেছে। সে তখুনিই আহত ঈশ্বরকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বাতিটা একেবারে কমিয়ে দেয়।

অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ ওঠে। কে বলে—এই দিকেই এল ব্যাটা। কোথায় গেল সেটা?

নন্তুর গলা শুনছে ঈশ্বর।

নন্তু গর্জায়—পেলে খতম করে দেব আজ। ছ্যাখ কোথাও ঢুকেছে কি না?

বাসিনী বাইরে কার ডাক শুনে চমকে ওঠে। ঈশ্বরও বুঝেছে তাকেই শেষ করার জন্য ফিরছে ওরা। দরজায় হাঁকছে কে।

—এ্যাই যে! কে আছো? খোলো দরজা!

বাসিনী দেখছে ঈশ্বরকে।

ঈশ্বর যেন ফাঁদে পড়ে গেছে। বাসিনীও চকিতের মধ্যে একটা আধ খালি বোতল হাতে নিয়ে গায়ের শাড়িটার আঁচল লুটিয়ে টলতে টলতে বের হয়ে গর্জে ওঠে।

—কোন শ্লা মুখপোড়া রে? এখানে কি করতে এসেছিস—ঘাটের মড়া। একটু মাল খাবো ফুর্তি করবো তার উপায় নাই। কোন শ্লা রে?

নহু চমকে ওঠে বাসিনিকে দেখে।

মতিবাবুর পেয়ারের বাসিনী। বাসিনীও চিনেছে তাকে।

বাসিনীও বলে—ডাকবো তোর বাপ মতিবাবুকে? ঘরের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—ওগো সেজবাবু, তোমার মেয়ে লোকের ঘরে কি ওই দত্যিদের আসতে বলেছো মাইরী—এ্যাই, ও সেজবাবু দ্যাখো তোমার লোকজন এসে জ্বালাচ্ছে!

নহু ঘাবড়ে যায়। মতিবাবুর মেয়েছেলের চোখ আছে তা জানে সে। এখানে তার মেয়ের সামনে এসে পড়েছে নহু।

নহুও বিপদে পড়েছে। তাদেরই কত্তাবাবুও যে এখানেই আসবে ভাবতে পারে নি।

নহু আর ব্যাপারটাকে না ঘাঁটিয়ে বলে দলবলকে—চল। শ্লা ঈশ্বর বোধ হয় অন্যদিকে পালিয়েছে। চল! দেখছি শ্লাকে।

ঘরে ফিরে এসেছে বাসিনী ওদের তাড়িয়ে।

গায়েব শাড়িটা তখন আধখোলা, চোখেমুখে উছল হাসির ভাব। বোতলটা ফেলে দিয়ে বলে বাসিনী।

—বুঝেছি, ওই শ্লারাই মেরেছে তোমায়? এখানে এসেছিল রং দেখাতে। শ্লা কুত্তার দল ল্যাজ গুটিয়ে দৌড়েছে। ইকি হাল করেছে ওস্তাজ, এ্যাঁ বদন বিগড়ে দিয়েছে। দাঁড়াও বাপু—একটু মেরামত করে দিই। আহা!

তাজা মদ খানিকটা দিয়ে ওর কপালের রক্তটা মুছে একটা ন্যাকড়া বেঁধে দেয় বাসিনী। ঈশ্বর চাইল ওর দিকে—একটু জল দেবে?

জল খেয়ে সুস্থ বোধ করে একটু ঈশ্বর।

উঠতে যাবে।

বাসিনী বলে—উঠো না, শুয়ে থাকো। অবশ্যি আমার ঘরে শুয়ে আছো তোমার বউ জানতে পারলে রক্ষে রাখবে না।

হাসে ঈশ্বর—ওসব বালাই-ই নেই।

বাসিনী দেখছে ওকে। বলে সে।

তাহলে বলো ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়। কিন্তু বদনামের ভয়ও নাই তোমার? ঝুমরিদলের মেয়ের ঘরে রইছো।

ঈশ্বর দেখছে মেয়েটিকে। মাথা নাড়ে ঈশ্বর। বলে সে—জুয়াড়ীর আবার বদনাম! ওতে ভয় নাই।

—সে কি গো! বাসিনী অবাক হয় ওর কথায়। দেখছে সে মানুষটাকে। হেসে ওঠে বাসিনী।

ঈশ্বর মেয়েটিকে আজ যেন নোতুন করে দেখে চিনেছে সে। তার জন্যই বেঁচে গেছে আজ রাত্রে। সে ওই ভাবে নন্তুর দলকে না তাড়ালে আজ নন্তু তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শেষই করতো। ব্যাপারটা বিচিত্র লাগে ঈশ্বরের কাছেও।

বলে ঈশ্বর—আমাকে হঠাৎ বাঁচাতে গেলে কেনে বলতে পারো? যদি ওরা জানতে পারে যে মিথ্যে কথা বলেছো ওরা ছাড়বে না তোমাকেও।

বাসিনীও জানে না কেন সে এভাবে বাঁচাতে গেল তাকে। তার শূন্য মনের কোণে কোথায় একটা ক্ষীণ সুর জাগে—আশার সুর। কিন্তু সে সব যেন মরীচিকার মতই মিথ্যা বলে মনে হয়।

বলে ওঠে বাসিনী—তোমার ছকে সেদিন নিজেকেই এড়ে দিতে চেয়েছিলাম, আর পাওনাও আছে তোমার কাছে। দেনদারকে বাঁচাতে হবে, নাহলে পাবো কি বলো। ওস্তাজ! জুয়োর ছক নিয়ে ঘুঁটি ফেলতে পারো ঠিক ঘাটে, জীবনের বোঝাটাকে কোন ঘাটে ফেলতে হয় সেটাই জানলে না?

চুপ করে থাকে ঈশ্বর।

রাত্রি নামে। ঈশ্বর বলে—এবার যাই। বাড়ি যেতে পারবো। অনেকটা ভালো বোধ করছি।

হেমন্তবালারা দলবল নিয়ে আসরে গেছে, একা বাসাতে সে ছিল তাই ওকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

ঈশ্বরের কথায় বাসিনী চাইল ওর দিকে। মাসীও দলবল নিয়ে ফিরবে। বাসিনীও তার মনের এই দুর্বলতাটার সন্ধান দিতে চায় না কাউকে। এটা গোপনেই থাক।

বলে সে—যাবে? চলো আমিই পৌঁছে দিয়ে আসছি। বাড়িতো ওই গাঁয়েই।

চমকে ওঠে ঈশ্বর—তুমিও যাবে? সেকি!

বাসিনী বলে।

—হ্যাঁ। একা ছেড়ে দিতে তোমাকে পারবো না ওস্তাজ। চলো সঙ্গেই যাই। ভয় নাই, বদনামের ভাগী তোমায় করবো না।

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে টর্চ হাতে নিয়ে বাসিনীও বের হলো ওর সঙ্গে। বাসিনী কি ভেবে বলে—দাঁড়াও। এই চাদরটা গায়-মাথায় জড়িয়ে নাও। হুট করে কেউ দেখলে চিনতে পারবে না।

বাসিনীও মাথায় ঘোমটা দিয়ে অন্য সাজে বের হলো অন্ধকারে।

ওদিকে মেলার কলরব চলেছে, মাঠের আলপথ ধরে রাতনির্জনে ফিরছে ঈশ্বর বাড়ির দিকে ওর সঙ্গে।

হঠাৎ মেলায় ওদিকে কিসের কলরব শোনা যায়. সার্কাসের বাইরে লোকজন চিৎকার করছে। আর্তনাদ ওঠে।

ঈশ্বর বলে—কি ব্যাপার?

বাসিনী শোনায়—যা হচ্ছে হোক, তুমি চলো তো।

সার্কাস-এর খেলা পুরোদমে চলেছে।

পেরেরা নিজে এসেছে, রিং-এর একপাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। জমে উঠেছে খেলা। ট্রাপিজের খেলায় জুলি, প্রমীলা আরও দু'জন ছেলের শো দেখার মত। রেনবো হয়ে দু'টো ভল্ট দিয়ে ক্লাউন নাথন যেন হাত ফসকে পড়ছে—সেও খেলা দেখানোর চেষ্টা করছিল,

নিচের জালে পড়ে তখনও চিৎকার করছে। দর্শকরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

—গুড শোম্যান শিপ!

রিং-মাস্টার এ্যান্টনিও দেখছে আজ ওই নাথনকে। নেলিও দেখছে নাথনকে। দু'জনের চোখে আজ নোতুন বিচিত্র একটি নেশা।

রিং-এর ওদিকে রশি দড়িদড়া খাঁচাগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে নেলি—ওর মাংসল দেহের রেখাগুলো সোচ্চার হয়ে উঠেছে। নেলির দু'চোখে নীরব জ্বালা ফুটে ওঠে। দেখছে সে নাথনকে।

নাথন বলে—সব ঠিক আছে নেলি।

নেলিও তাব ভবসাতেই আছে। চোখের সামনে এ্যান্টনির ওই ব্যবহাব সে সইতে পারছে না। নেলি নাথনকে কাছে টেনে নেয়। ওব দেহের স্পর্শ নাথনেব মনে ঝড় তুলেছে।

নেলি বলে—আমিও রেডি নাথন। দু'জনে আজ বাতেই চলে যেতে পারি। দেশেই চলে যাবো তুমি আব আমি। কাজ শেষ করে।

নাথনও স্বপ্ন দেখছে। বিচিত্র নেশা আনা স্বপ্ন।

কেরালার বন-পাহাড়ের নিভৃতে ফিরে যাবে তারা দু'জনে—বিকৃত বেঁটে লোকটা চিরকালই মেয়েদের ঘৃণা অবহেলা সয়েছে। শুধু নেলি তাকে ভালোবাসে, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়। নাথন মনে মনে স্বপ্ন দেখে।

ঘণ্টা বাজছে।

পরের খেলার ঘোষণা চলছে।

নেলি বামনটার রং-মাখা গালে তার নরম গাল ঘষে এখান থেকেই ওর অর্ধ-অনাবৃত দেহের রেখায় ঢেউ ছড়িয়ে ছুটে গেল এরিনাতে তার খেলা দেখাতে।

জুলি আর এ্যান্টনি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসছে। এ্যান্টনির চোখেও স্বপ্নের ঘোর। সে দেখেছে ওদের দু'জনকে।

হাততালির শব্দে ওদের চমক ভাঙে।

জুলির হাতখানা ওব হাতে। এই সপ্তাহেই ওদের বিয়ে। ওরা তাই দু'জনে দু'জনকে কাছে চায়।

এ খবর জানে নাথনও। নেলিই বলেছে তাকে। ওরা ঘর বাঁধবে।

জুলি বেঁটে বামন লোকটাকে দেখে ঘৃণা ভরে চাইল।—কি করছো এদিকে? ইউ সোয়াইন!

বেঁটে নাথন বলে—নেকস্ট খেলা—বাঘের সঙ্গে ফাইট! খাঁচাগুলো নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।

নাথনের দু'চোখে কি তীব্র জ্বালা ফুটে ওঠে। এ্যান্টনি জানোয়ারের চোখ, তাদের স্বভাব, চাহনি চেনে। সে দেখলে হয়তো চমকে উঠতো। বেঁটে বামনটা দত্যি হয়ে গেছে। ওর চোখ দুটো জ্বলছে খাঁচার বদ্ধ বুভুক্ষু হিংস্র বাঘিনীর মতই।

কিন্তু এ্যান্টনি আর জুলি নিজেদের স্বপ্নেই মশগুল।

ওই জানোয়ারটার দিকে চাইবার অবকাশ তাদের নেই। জুলি বলে—এ্যাই! নেকস্ট শো তোমার! গুডলাক।

এ্যান্টনি এগিয়ে যায় রিং-এর দিকে।

হাততালির শব্দ ওঠে। এরা বাঘের চাকা লাগানো খাঁচাগুলো এগিয়ে নিয়ে গেছে রিং-এর মাঝখানে। সহকারী রোজারিও রয়েছে পাশে। এ খেলাটি এ্যান্টনিব খুব নাম করা। চারটে বাঘকে নিয়ে খেলা দেখায়।

দু'-তিনটে বাঘকে ছাড়া হয়েছে, এ্যান্টনির চাবুকের শব্দ ওঠে—কাম অন। সিট ডাউন, কাম অন!

চাবুকের শব্দে এ্যান্টনিব চিৎকারে বাঘগুলো একে একে এসে বসেছে—চাবুক ঘুরছে শূন্যে। ওদিকের বাঘের খাঁচার মধ্যে সেই তেজী ক্ষুধার্ত বাঘিনীটা ল্যাজ সাপটাচ্ছে—সেই খাঁচার দরজাও খোলা হবে এবার। বাঘিনীটার মেজাজ ভালো নেই।

আজ তাকে খেতেও দেয়নি, জল অবধি দেয়নি, উলটে নাথন মোটা লাঠি দিয়ে সময় অসময় আজ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রাগিয়ে রেখেছে। খাঁচার দরজা খোলা সত্ত্বেও সে বের হতে চায় না। গজরাচ্ছে—গ-র্-র্—

যেন খেলার মেজাজ নেই এই কথাটাই বার বার জানাতে চায় সে।

চাবুক হাঁকড়াচ্ছে, বাঘটাও গর্জায় দাঁত বেব কবে।

—কাম অন। এ্যাণ্টনি চিৎকার করে।

বাঘিনীটা নড়ে না। মুখ বিকৃত করে গজরাচ্ছে। নাথনও ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তার করার কিছু নেই। মনে মনে সে যেন কাতর হয়ে কি প্রার্থনা করছে শয়তানের কাছে। তার মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়।

চাবুকের ঘা পড়তেই বাঘিনীটাও এবার খাঁচা থেকে বের হয়ে এসে লাফ দিয়েছে শূন্যে—চমকে ওঠে এ্যাণ্টনি! বাঘিনীটার দু'চোখ জ্বলছে—চিৎকার করে চাবুকটা হাঁকাতে যাবে এ্যাণ্টনি।

তার আগেই বন্দী বাঘিনী বনের আদিম হিংস্রতা নিয়ে লাফ দিয়ে পড়েছে ভারি দেহ সমেত এ্যাণ্টনির উপর—আর জন্মগত অভ্যাসেই তাব থাবা দুটো বসেছে এ্যাণ্টনির কাঁধে—ধারালো দাঁত বসেছে ওর কাঁধে। গলাটাই ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। তবু সেই প্রচণ্ড আঘাতে কাবু হয়ে গেছে এ্যাণ্টনি।

ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে, পড়ে গেছে এ্যাণ্টনি মাটিতে। চিৎকার করে ওঠে জুলি—এ্যাণ্টনি-ই...

তৃষ্ণার্ত বাঘিনীটা যেন ওই রক্তের স্বাদে মেতে উঠেছে। সহকারী রোজারিও সজোরে ওই বাঘিনীর মুখেই বসিয়েছে ইলেকট্রিক হাণ্টারটা।

বাঘিনী ওকে ছেড়ে দিয়ে এবার রোজারিওকেই আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। চাবুকের আর একটা ঘা পড়েছে চোখের উপর! তীব্র বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে বাঘটা।

ততক্ষণে সারা সার্কাসে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। আরও তিনটে বাঘ রক্তের গন্ধে গজরাচ্ছে! সার্কাসের দর্শকরা ভয়ে চিৎকার করে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছে। গ্যালারি থেকে লাফ দিয়ে পড়ছে কেউ, কেউ হুড়মুড়িয়ে পড়ছে অন্যের ঘাড়ে—ভিড়, ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তিতে কাঠের গ্যালারি ভেঙে চাপা পড়ছে অনেকে।

রক্তাক্ত জ্ঞানহীন দেহটা পড়ে আছে এ্যান্টনির। জুলি চিৎকার করছে—ড্যাডি! এ্যান্টনি—

মেলায় তখন জনসমুদ্র।

দোকান-পশারে আলো জ্বলছে। কেনা-কাটা চলেছে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে যাত্রীরা এসেছে।

ওদিকে নটবরের আসরে গান জমেছে।

গ্রাম্য দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে মোহিনীর নাচ দেখছে ঐ আসরে।

খাবার দোকানে রাশিকৃত জিলাবী, গজা। সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে বিক্রি করে চলেছে দোকানদার। সবচেয়ে ভিড় জমেছে যাত্রার আসরে!

তখন বীর দর্পে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হচ্ছে নিজনপুর রাজার সৈন্য দল!

...মেলায় হঠাৎ খবরটা ছড়িয়ে পড়ে।

কেউ জানে না—কেউ দেখেনি। তবু জমাট আতঙ্ক নামে। কে বলে—সার্কাস-এর তাঁবুতে ছুটো বাঘ, রিং মাস্টারকে মেরে গ্যালারিতে লাফ দিয়ে উঠে পটাপট্ লোকের ঘাড় মটকে এবার বাইরে বের হয়ে মনোহারী পটির দিকে ছুটে চলেছে।

চমকে ওঠে সবাই।

—বাঘ! বাঘ বের হয়েছে। মানুষ মেরেছে!

কলরব ওঠে। নিমেষের মধ্যে মেলার সেই আনন্দমুখর

পরিবেশটা বদলে যায়। নাগরদোলা ঘোরা থেমে গেছে। সেখান থেকে হুমদাম লাফ দিয়ে পড়ে দৌড়চ্ছে।

মেয়েছেলের দল আর্তনাদ করে—এদিক ওদিকে দৌড়চ্ছে।

ঝপ্ ঝপ্ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়, যেন তেরপলের পর্দা ঠেলে বাঘ আর ঢুকতে পারবে না।

কে দৌড়চ্ছে—কে ছিটকে পড়লো।

সারা মেলা পরিণত হয়েছে আতঙ্কের এক রাজ্যে। বাদল ঘোষ দৌড়ে একটা আমগাছের ডালে উঠে হাঁকছে—ভয় নাই! ভয় নাই। আপনারা শান্ত হোন!

কে কার কথা শোনে!

ওর দেখাদেখি ঝুপ ঝাপ করে সমর্থ পুরুষের দল গাছেই উঠছে। কেউ দৌড়চ্ছে মাঠ দিয়ে। মেলায় তখন আর্তনাদ—কলরব ওঠে।

সারা মেলার বাদ্যি বাজনা থেমে গেছে, দৌড় প্রতিযোগিতা আর আর্তনাদ শুরু হয়েছে। বাঘগুলো যেন সব বের হয়ে এত লোককে উবু উবু গিলে নেবে।

যাত্রার আসরে তখন টিনের তলোয়ার হাতে আর টিনের ভল্লা সহ সৈন্যদল নিয়ে সেনাপতি বীরভদ্র বিরাট শত্রুবাহিনীর সঙ্গে লড়ছে। বাঘ বের হবার কথা শুনে মহাবীর বীরভদ্র টিনের তলোয়ার ফেলে জরির পোশাক সমেত আমগাছের মগডালে উঠে চীৎকার করে—বাঁচাও!

হেমন্তবালাও কোনরকমে আসর গুটিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে হাতির মত একাৎ ওকাৎ করে হেঁটে তালপাতার ছাউনি দেওয়া বাসায় এসে ধপাস করে বসে চিৎকার করে—ও লো তোরা সব ঠিক আছিস তো লা? অ বাসি-কুসুম—কোথা গেলি তোরা! কি কাণ্ড বাছা!

চিলের মত সরু গলা লোকটার। জনার্দন এই শীতের রাতেও ঘামছে কুল কুল করে।

বলে সে—সাংঘাতিক কাণ্ড! দুটো লাশ পড়ে গেছে। একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে, তারপর নাকি লাফ দিয়ে বের হয়ে মেলায় ঢুকেছে। ওরে বাবা।

জনার্দন ধমকে ওঠে ঢুলিটাকে—দরজা দে ব্যাটা। বাঘ বলে কথা। ধরলে আর জ্যান্ত রাখবে না।

হেমন্তবালা ঘামছে। বলে সে—তাই নাকি রে! ওরা বাঘ-গুলোকে খাঁচায় ঢুকিয়েছে ততক্ষণে।

·

নাথন বেশ বুঝেছে এখানে তার ঠাঁই নেই। রোজারিও এখন সার্কাসের সেকেণ্ড ম্যান, ওরই চার্জে এ সবকিছু। তার ব্যাপারটা বোধহয় জেনেছে এরা।

নাথন আর নেলি এবার দু'জনে ওদের তাঁবুতে এসে বসলো। বাইরে তখন তাঁবু থেকে বহু আহত-রক্তাক্ত লোকদের টেনে টেনে বের করছে। ভিড়ে আহত হয়েছে অনেকে। মতিবাবুও এসে পড়েন।

রবি সরাওগীর কোন পাত্তা নেই। সে আগেই চলে গেছে।

থানার দারোগাবাবু বলেন—মেলার প্রেসিডেন্টের স্টেটমেণ্ট চাই। এতবড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেল মতিবাবু।

মতিবাবু এতকাল মেলার কর্তৃত্ব করে এসেছেন, এসব কাণ্ড কোন দিনই ঘটেনি। আজ এত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটতে খুশীই হয়েছেন মতিবাবু।

বলেন তিনি—রবি সরাওগীকে গিয়ে বলুন। এবার তিনিই তো প্রেসিডেন্ট, আর সেক্রেটারী ওই বাদল ডাক্তার। দেখুন তাদের।

খোকন মিত্তিরও খুশী হয়েছে। সে বানের আগে খড়-কুটোর মত দৌড়ায়। বলে ওঠে খোকন মিত্তির ভালো মানুষের মত।

—শুনলাম মেলাতে লুঠতরাজ হয়েছে। এসব তো আগে ছিল না এখানে। অথচ দেখুন—রবিবাবু, বাদলবাবুরা মেলার কর্মকর্তা, তাঁদের এত বড় কাণ্ডেও খেয়াল হয়নি! পাত্তাই নাই তাদের।

দারোগাবাবু বলেন—তাই দেখছি। এরপর সদরে খবর যাবে, তারপর এস-পি সাহেবই আসবেন। বিপদে পড়েছি আমরা। এদিকে কত্তাদের দেখা নেই।

মতিবাবু মনে মনে খুশী হয়ে বলেন—ব্যস্ত আছেন, এসে পড়বেন বোধহয় ওরা।

বাদল ঘোষ তখনও গাছের উপরই রয়েছে। পাতার আড়ালে তাকে দেখা যায় না, কিন্তু সে দেখেছে দারোগাবাবু, কনস্টেবল সমেত মতিবাবু, খোকন মিত্তিরকে।

তারা চলেছে ওই দিকে রিভলবার বাগিয়ে।

বাদল বুঝেছে ব্যাপারটা চরমেই উঠেছে। ওদিকে ঈশ্বরকে কারা বেদম মারধোর দিয়ে তার সব তহবিল লুটপাট করে নিয়েছে।

ঈশ্বরও বোধহয় খুবই আহত, বেঁচে আছে কি কে জানে। এদিকে আবার বাঘ-এ মেরেছে ক'টা লোককে কে জানে। পুলিশও বাঘের জাত।

রক্তের গন্ধ পেয়েই এসে জুটেছে।

আর খুঁজছে রবি সরাওগী আর তাকে। রবি সরাওগী মেলার প্রেসিডেন্ট, সেও অন্যতম কর্মকর্তা। তাদেরই খুঁজছে পুলিশ। মতিবাবু, খোকন মিত্তিরের সব কথা শুনেছে সে গাছের উপর থেকে।

তাদের ঘাড়েই পুরো দোষ চাপিয়েছে তারা। এবার আসামী হয়ে খুনের দায়ে, দাঙ্গা লুটপাটের দায়ে তাদের জেলে না যেতে হয়।

বাদল ঘোষ তক্কে তক্কে ছিল।

ওরা চলে যেতেই গাছ থেকে নেমে এবার দৌড়চ্ছে সে গ্রামের দিকে। যে ভাবে হোক রবি সরাওগীকে ডেকে এনে হাজির করতে হবে! ওরা যেন না ভাবে তারা কেউ ছিল না মেলায়।

রবি সরাওগী রাতে তেমন ঘুমোয় না।

তার ঘরে এখন দুনম্বরী টাকা বেশ জমেছে। ডাকাতের ভয়ে সে সাবধানে থাকে।

সেও মেলার দিক থেকে ওই আর্তনাদ গোলমাল শুনে জেগে উঠেছে। কে জানে ডাকাতই পড়েছে বোধহয়। এমন সময় বাদলকে এসে গেটে হাঁকতে দেখে চাইল রবি সরাওগী। শুধোয়।

—ক্যা হয়েছে বাদল ?

বাদল আর্তনাদ করে।

—সব্বোনাশ হয়েছে মেলায় রবিবাবু, লুটপাট করে কারা ঈশ্বরকে বেদম মেরে নাকি গুম করে দিয়েছে।

চমকে ওঠে রবি সরাওগী !

—হ্যাঁ।

বাদল বলে—আর সার্কাসের বাঘ বের হয়ে মানুষ খুন করেছে। জলদি চলুন রবিবাবু, পুলিশ দারোগা বন্দুক নে এসেছে। আপনার খোঁজ করছে।

রবি সরওগী নেমে আসে !

শুধোয় সে—হামাকে খুঁজছে কাহে ?

—আপনি প্রেসিডেণ্ট !

বাদলের কথায় গর্জে ওঠে রবি সরাওগী—নেহি। হম্ পেসিডেণ্ট নেহি !

বাদল আর্তনাদ করে।

—ওখানে গিয়ে সেই কথা বলবেন রবিবাবু, নাহলে পুলিশ ছাড়বে না। কোমরে দড়ি পরিয়ে নিয়ে যাবে !

চমকে ওঠে রবি সরাওগী। বাদল বলে।

—চলুন তো। গিয়ে সব বলে কয়ে ব্যবস্থা কিছু হবে !

রবি সরাওগী বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে আসছে। গজরাচ্ছে—তুম ফাঁসায়া বাদল। হম্ কভি পেসিডেন নেহি হোগা।

দু'জনে আসছে।

মেলায় তখনও কলরব উঠছে। টর্চ জ্বেলে অনেকে অন্ধকারে

লাঠি সড়কি নিয়ে বাঘ খুঁজছে সাহস ভরে। কে জানে এখনও যদি কোন বাঘ সটকে থাকে।

হঠাৎ টর্চের আলো মুখে পড়তে রবি সরাওগী বাদলকে জড়িয়ে ধরে—অব্যক্ত আর্তনাদ করে ওঠে।

ওর গায়ে ডোরাকাটা চাদর—আলো পড়ে বাঘের গায়ের মতই লাগছে।

কলরব ওঠে—বাঘ! এই যে! হুঁশিয়ার।

বাদল চীৎকার করে—কে জানে লাঠি নাহয় সড়কি চালাবে ওরা। বাদল ককিয়ে ওঠে—বাঘ নই গো। আমি বাদল ঘোষ, আর ইনি রবিবাবু!

বাঘ না পেয়ে হতাশ হয়ে উৎসাহী লোকগুলো গর্জে ওঠে—শালা! দারোগাবাবু মতিবাবুরা এগিয়ে আসে।

—এই যে রবিবাবু, প্রেসিডেন্ট হয়ে কোথায় ছিলেন। এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল মেলায়। লুট-গুম, খুন-বাঘের হাতে মরলো মানুষ।

রবি সরাওগী বলে—হায় রামজী। হম না জানে দারোগা সার। ওই শালা বাদল জোর করে পেসিডেন বানালো! মতিবাবু, জান বাঁচাইয়ে। হায় বাপু।

রবি সরাওগী কাঁপছে এবার। বাদল ঘোষের নেশা ছুটে গেছে। সেও ঘাবড়ে গেছে।

মতিবাবু বলেন—স্টেটমেন্ট দিতে হবে, আপনি চেয়ারম্যান—বাদল তুমি সেক্রেটারী, চলো—পুলিশকে স্টেটমেন্ট দিতে হবে।

রবি গর্জে ওঠে—এ্যাঁ। খুন-মার্ডার-পুলিশ! ওসব পেসিডেন্ট-ফেসিডেন্ট আমি হবো না, কভি নেহি। এ বাদল—শালা হারামজাদা। ইসব হোবে কাহে বললো না? এ্যাঁ—

গর্জাচ্ছে রবি সরাওগী! এবার ওই রক্তারক্তি-খুন-পুলিশের নামে ঘাবড়ে গেছে সে। সদরে কেস উঠবে, তার অন্ধকারের

কারবার নিয়ে গোলমালের ভয়েই এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় সে। এবার যেন সেও জালে জড়িয়ে গেছে।

দারোগাবাবুর বিশাল গোলমুখ—কাটা গোঁফ আর গোল জ্বলজ্বলে চোখ দুটো দেখে মনে হয় ওই যেন একটা বাঘ। বাঘটা এবার তার উপরই লাফ দিয়ে পড়বে। ভয়ে কাঁপছে রবি সরাওগী। বলে সে।

—ই ক্যা হোল মতিবাবু, এত্না নক্সা হোবে, কোন হারামী জানতো? তাহলে ইসব হতো না হামি।

দারোগাবাবুও এবার কিছু রোজগারের মওকা পেয়ে গেছে। সেও গোঁফ চাগিয়ে চাপা স্বরে গর্জন করে।

—চলুন, স্টেটমেন্ট দিতে হবে। মেলায় এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল—আপনারা কিনা ঘরে বসে আছেন?

মতিবাবু এবার হাসছেন খিক-খিক করে।

খোকন মিত্তিরও খুশী হয়েছে। এবার গুছিয়ে নিতে হবে তাকে। দারোগাবাবুও চেপে ধরেছে রবিবাবুকে। তারও কিছু আমদানী হবে বোধহয়। হোক। জব্দ হোক রবি সরাওগী।

ঝড় থেমেছে কিছুটা। ক্লান্ত নাথন আর নেলি তাদের তাঁবুতে বসে এবার শান্তিতে বসে মদ গিলছে। আজ তাদের নিষেধ করার কেউ নেই। তাদের কাজ শেষ হয়েছে এখানে।

নাথন যে এত বড় কাজটা করেছে তা কেউ আর টের পায়নি। নেলি হাসছে।

নাথন বলে—চল! যাবি না নেলি?

হাসছে নেলি! সারা দেহে ওর হাসির জোয়ার। বলে ওঠে নেলি—তুই একদম বোকা! বুদ্ধু!

চমকে ওঠে নেলি—বামনটার কুৎসিত চাহনি ওর গায়ে বেঁধে।

নাথন অবাক হয়—নেলি!

ঘামছে বেঁটে দানবটা। নেলির ওই দেহটাকে সে আজ উন্মাদের

মত জড়িয়ে ধরে দখল নিতে চায়। সে তার জন্যই এইসব করেছে। ভেবেছিল নেলি রাতের অন্ধকারেই পালাবে তার সঙ্গে। কিন্তু নেলি যেতে চায় না। এখানেই বোধহয় অন্য কোন পুরুষ তার আছে। তাই বামন নাথন আজ ক্ষেপে উঠেছে।

—নেলি!

নাথনের কুৎসিত বিকৃত দেহটা ঘেয়ো কুকুরের মত। নেলি চমকে ওঠে। ওকে আজ ওই ক্ষুদে শয়তানটা দখল করতে চায়। নেলি ঘৃণায় রাগে বামনটার পিঠে সজোরে এক লাথি মারে।

ছিটকে পড়ে বেঁটে বামনটা, তাঁবুর পোষ্টে লেগে ঠোঁটটা কেটে গেছে। রক্ত ঝরছে। নেলি ফুঁসে ওঠে—কুত্তা কাঁহিকা! ভাগ এখান থেকে। ভাগ বলছি।

বামনটাও আবার এগিয়ে আসছে, লাফ দিয়ে পড়বে তার উপর। চোখে ওর হিংস্র দৃষ্টি।

নেলি বিছানার নিচ থেকে ফস করে ছোরাটা বের করে গর্জায়—এগিয়ে এলে তোকে খতম করে দেব। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সাধ! কুত্তা—এইভাবে এ্যান্টনিকে শেষ করেছিস তুই! তুই একটা জানোয়ার! সবাইকে বলে দেব!

চমকে ওঠে বামনটা। এ খবরটা কেউ জানলে তার বাঁচার উপায় থাকবে না। বুড়ো পেরেরা তাকে বাঘের খাঁচাতেই ফেলে দিয়ে প্রচার করবে আর একটা দুর্ঘনাই ঘটে গেছে তাঁবুতে!

ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে নাথন—নেলি!

নেলি এ চায়নি। এ্যান্টনিকে সেও মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। তাকে জব্দ করতে চেয়েছিল মাত্র। কিন্তু বামনটা এভাবে ওকে শেষ করে দেবে তা ভাবেনি।

নেলি গর্জে ওঠে—দূর হয়ে যা এখান থেকে। এখানে কাল সকালে তোকে দেখলে সব কথাই আমি বলে দেব। নিকাল আভি! নিকাল যা কুত্তা—জানোয়ারকা বাচ্চা!

নাথন চুপসে গেছে।

তার এত স্বপ্ন নেলি যে এভাবে শেষ করে দেবে তা ভাবতেই পারেনি। এখন এখান থেকে পালাতেই হবে তাকে। এখানে আর তার ঠাঁই হবে না। কথাটা প্রকাশ পেলে কোন সার্কাসেই তাকে নেবে না আর। প্রাণটা চলে যাবে এখানে থাকলে।

রাতের অন্ধকারে বের হয়ে এল লোকটা—বেঁটে কুৎসিত এক ক্লাউন জীবনের এক নিষ্ঠুর খেলায় বিচিত্র ভূমিকা নিয়ে আজ হাসিকে ব্যর্থ জ্বালাভরা কান্নায় ভরিয়ে তুলেছে নাথন।

তারা-ভরা আকাশের চাঁদোয়ার নিচে এসে দাঁড়িয়েছে নাথন।

এ যেন বিরাট একটা এরিনা। আকাশের আশমানের হাজারো তারার রোশনী জ্বলে। নাথন যেন এখানের এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে কি বেদনায় কাঁদছে।

ঠকে গেছে সে, এ্যান্টনিকে আঘাত করতে গিয়ে সে নেলির কাছে, জুলির কাছে, এ দুনিয়ার সকলের কাছে হেরে গেছে।

কার হাসির শব্দ ওঠে। আকাশ ফাটিয়ে হাসছে এ্যান্টনি। বিরাট দশাসই চেহারা। দু'চোখের তারায় হাসির ঝলক। চমকে ওঠে নাথন। বেঁটে মানুষটাকে যেন রক্তাক্ত দেহ নিয়ে এ্যান্টনি তাড়া করছে। দৌড়চ্ছে সে।

পালাচ্ছে ভীত ত্রস্ত একটি বিকৃত মানব রাতের অন্ধকারে। নাথনের এখানে আর কোন ঠাঁই নেই।

গুপী ভাবতে পারেনি কাজটা এমনি হঠাৎ বেধে যাবে। ভজনও ছিল ওপাশে, সেও টের পায়নি। এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বুঝতে পারে যে তাদের হিসাব করেই ওই নন্তুর দলই আক্রমণ করেছিল।

গতকাল গুপী তাকে মেরেছে—তার টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়েছে আজ তারা ছলছুতো করে অন্য লোক দিয়ে গোলমাল বাধিয়ে সর্বনাশ করেছে।

ভজনও আহত, গুপীও চোট পেয়েছে।

তবু ওই অবস্থাতে তারা দৌড়ে এদিকে ওদিকে সরে গিয়ে বেঁচেছে, ফিরে এসেছে ওস্তাদের বাড়িতে।

কিন্তু তখনও ঈশ্বর ফেরেনি!

খবরটা শুনে আর রক্তাক্ত ভজন-গুপীদের দেখে পিসী হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

—তাকে কোথায় রেখে এলি রে সব্বোনাশীর ব্যাটারা? এ্যা নিজেরা ফিরে এলি আমার ঈশ্বর কোথায় গেল রে?

গুপী বলে—মদনা-নন্থকে পাঠিয়েছি খুঁজতে। তারা খব আনবে পিসী। যেভাবে হোক ওস্তাজকে আনবেই।

ওরা অপেক্ষা করছে কাদের ফেরার।

হয়তো বেশ চোট পেয়েছে ওস্তাজ!

ওদিকে মেলার কলরব আর্তনাদ—বাঘ বের হবার খবর হাওয়া ভেসে আসে। লোকজন—মেয়ের দল প্রাণ ভয়ে চীৎকার কে দৌড়চ্ছে গ্রামের পথে।

ফিরে আসে মদন—নন্থ!

পিসী আর্তনাদ করে—খবর পেলি সেটার? বেঁচে আছে ন মানুষের লাঠিতেই মরেছে?

নন্থ বলে—কোথাও খুজে পেলাম না গুপীদা। মেলায় বা বের হয়েছে। ছুটো লোকও মেরেছে।

পিসী এবার আর্তনাদ করে ওঠে।

—ওরে বাপ ঈশ্বররে। তুই কোথা গেলি রে? কোন শত্তুে তোর এতবড় সব্বোনাশ করলো রে।

গুপী থামাবার চেষ্টা করে—থামো পিসী। এসব কিছু হয়নি গো

—তবে কেন সে ঘরে এলনা রে?

পিসীর চোখে জল নামে। এরাও ভাবনায় পড়েছে।

কাঁদছে সে। পিসী বলে।

—কত বলেছি মুখপোড়াকে ওপথে যাসনি। ভালোমানষের পথ ও নয় এখন বেঘোরে কোথায় যে রইল! ওরে—ছাখ!

ভজন বলে—একটু ফরসা হোক পিসী, এই রাতের আঁধারে কোথায় দেখবো তাকে।

পিসী ডুকরে কেঁদে ওঠে—ওরে ঈশ্বর রে—তোকে কে কি করলো বাপ! এইটু থেকে মানুষ করে তোকে যমের হাতে তুলে দিলুম রে।

হঠাৎ দরজা ঠেলে চাদর জড়ানো ফেট্টি বাঁধা অবস্থায় ঈশ্বরকে নিয়ে একটি মেয়েকে ঢুকতে দেখে চাইল পিসী। ও যেন বিশ্বসাই করতে পারে না ঈশ্বর সশরীরে ফিরেছে।

পিসী হ্যারিকেনটা নিয়ে এগিয়ে এসে দেখছে ঈশ্বরকে।

—একি হাল করেছে তোর? শখ মিটেছে মুখপোড়া। মরলি না কেন? হাড় জুড়োতো আমার।

ঈশ্বর বলে—একেবারে শেষ করে দিত পিসী। তোমারও জ্বালা জুড়োতো তা বাঁচিয়ে দিল এই-ই।

ঈশ্বর পিসীকে দেখায় বাসিনীর দিকে। বাসিনী বলে—আমাদের ওখানেই গিয়ে পড়েছিল। ভয় নেই। তেমন কিছু হয়নি। সেরে যাবে।

পিসী বাসিনীকে দেখছে, ঢল ঢল মুখ, ডাগর চোখ, কোমল মুখখানা।

পিসী বলে—বসো বাছা। আমার হয়েছে মরণ এই আপদকে নে। বসো। খুব বাঁচিয়েছো বাছা!

পিসীর সযত্ন হাতের চিহ্ন সর্বত্র। নিকানো উঠান—ওপাশে ধানের গোলা—গোয়ালে গরুও রয়েছে, উঠানের কোণে নিকানো তুলসীমঞ্চ। শান্ত একটি পরিবেশ। বাসিনী দেখছে ঈশ্বরকে।

বলে বাসিনী—ওকে শুয়ে পড়তে বলুন পিসী, একটু গরম দুধ খাইয়ে শুতে পাঠান। আর আটকে রাখবেন ছেলেকে যেন ওই মেলায় আর জুয়োর দান না নিয়ে বসে। এবার তাহলে নিজের জানটাকেই জুয়োর ছকে বাজি এড়ে দিতে হবে।

পিসীও মেয়েটিকে তার কথার সমর্থন করতে দেখে খুশী হয়ে বলে ঈশ্বরকে।

—শোন, কথাটা শোন মুখপোড়া। ওই মেয়ের ঘটে যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

চুপ করে থাকে ঈশ্বর। আজ তার বিপদের কথাটা ভাবছে সে। গুপী, ভজন সবাই যে যার প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। ওই নেকড়ের দল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

মেয়েটা আশ্রয়ই দেয়নি, তাকে ওই নেকড়ের পালের হাত থেকে বাঁচিয়েছে নিজেব এতবড় বিপদ মাথায় করে।

বাসিনী বলে।

—খুব জ্বালায় বুঝি আপনাকে পিসীমা ?

পিসীর ভালো লাগে মেয়েটিকে। পিসী বলে।

—আর বলো না বাছা। কত বলি, এবার বড় হয়েছিস। বিয়ে থা কর। থিতু হ। কে শোনে কার কথা! এবাব ঠাণ্ডা হবে!

হাসে ঈশ্বর তুমি খুব খুশী হও না পিসী ?

পিসী বাসিনীর দিকে চেয়ে বলে—হবোই তো!

ঈশ্বরকে বিছানায় শুইয়ে বের হয়ে আসে পিসী। বাসিনী দেখছে শান্ত সংসারের ছবিটা। তার স্বপ্নেও যেন এমনি একটি ঘর, এমনি একটি মানুষের কথাই ভেবেছিল সে।

বের হয়ে, পিসী বলে।

—তোমার কোন গাঁয়ে বাড়ি বাছা ? মেলা দেখতে এসেছিলে

বাসিনী হাসল। তার পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই, এতবড় দৈন্যটা এত প্রকট করে কোনদিনই মনে হয় নি।

বাসিনী বলে—আমি যাই পিসী। ওকে একটু সাবধানে রাখবেন।

বের হয়ে যায় বাসিনী। পিসী বলে।

—একা যেতে পারবে রাতে ?

বাসিনী পথ চেনে। বলে সে—হ্যাঁ!

কোনরকমে বের হয়ে এল সে।

গুপী-ভজনরা অবাক হয় বাসিনীকে দেখে। কালকের রাতের সেই মেয়েটি। ঈশ্বরকে বলে—ওকে কোথেকে পেলে ওস্তাজ।

ঈশ্বর এ নিয়ে কথা বাড়াতে চায় না। বলে সে।

—যেতে দে ওসব কথা। তোদের মুরোদ বোঝা গেছে। এবার ভাবছি—জোর বেঁচে গেছি। ওপথে আর যাবো না।

পিসী সায় দেয়—তাই ভাব এবার।

সামনে ওই চ্যাঙ্গাদের দেখে পিস্নী গর্জে ওঠে।

—বেরো মুখপোড়ার দল। ফের যদি দেখি ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দোব তোদের।

হেমন্তবালা চমকে ওঠে। ওঘরে বাসিনী নেই।

—গেল কোথায়? ওরে অ জনার্দন।

জনার্দনও এসে পড়ে। বাসিনী নেই।

বাসিনী আজ তার দলের সেরা গাইয়ে নাচিয়ে। তার নামেই দল চলে।

হেমন্ত বলে—কারো সঙ্গে ভাগানী পেয়ে চলে যায়নি তো রে? ও বাবা! কি হবে গো?

জনার্দন বলে—জিনিসপত্র সবই রয়েছে যাবে কোথায়? ভয় হয় ওদের। চারিদিকে তার জন্য খোঁজ খোঁজ রব ওঠে। হেমন্তবালা এদিক ওদিক করছে, হঠাৎ বাসিনীকে ঢুকতে দেখে চাইল।

হেমন্তবালা শুধোয়—কোথায় ছিলি? ওদিকে বাঘ বেরিয়েছে।

বাসিনী বলে—ভয় নাই, বাঘেও ছোঁবে না গো তোমার বাসিনীকে বুঝলে মাসী, চ্যামনা সাপে যাকে দংশন করে কোন জাত সাপ আর তাকে ছোঁয় না। শ্লা চ্যামনা সাপের নজরেই গেলাম।

জনার্দন দেখছে ওকে। বাসিনী ধমকে ওঠে।

—মরণ, হাঁ করে দেখছো কি বাঁধনদার। বাসিনীর গা-গতর কি দেখোনি? ওই তোমার একটা পোষা ঢ্যামনা সাপ মাসী।

জনার্দন দাঁত বের করে হাসে—কি যে বলিস! উঃ বাঘে একটা লোককে খেল, বাকীগুলো বের হয়ে লাফ মারতো ঘাড়ে, নেহাৎ আটকে ফেলেছে ওদের। তা দশাসই সাহেবকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে রে? জনার্দন এর মধ্যে মেলার হালফিল খবরও এনেছে। জনার্দন বলে চলেছে ওদের তাঁবুর জীবনের সেই প্রেমের কথা। বলে—সে আহা মেয়েটির কি কান্না! ওর সঙ্গে লোকটার বিয়ের সব ঠিক—এমনি সময় ওই কাণ্ড ঘটে গেল! বেচারা।

বাসিনী শুনছে কথাগুলো।

এমনি করেই নিষ্ঠুর দুনিয়ায় যেন সব হারিয়ে যায়। কোথাও কোন শান্তির সন্ধান নেই, আশ্বাস নেই, চোখের সামনে বাসিনীর সেই ছোট সাজানো সংসারের একটা মানুষের মুখের ছবিটা ভেসে ওঠে।

বাসিনীর কাছে এই জীবন কি অসহ্য জ্বালাময় বোধহয়। কোথায় দূরের কোন আলোর আভা বার বার হাতছানি দেয় তাকে।

একটি মানুষ—সেই ঘর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বলে সে—এ আর ভালো লাগে না পিসী। পথে পথে ঘুরে কোনদিন পথেই ফুরিয়ে যেতে হবে এই নরকে। এর থেকে কি মুক্তি নেই?

এর জবাব হেমন্তবালাও জানে না।

এই জ্বালাতে সেও জ্বলেছে। আজ জ্বলছে বাসিনী। অনেকেই।

বাসিনী বলে।

—মনে হয় বিষ খেয়ে সব শেষ করে দিই মাসী!

হেমন্ত চমকে ওঠে। বলে সে।

—বালাই! ষাট! যা—নেশা করে যাতা বকিস না। রাত হয়েছে। শোগে যা। যা কাণ্ড গেল!

বাসিনী চলে গেছে।

রাত্রি নামছে। মেলার সব গোলমাল থেমেছে। শান্ত স্তব্ধতার মাঝে কার ক্ষীণ কান্নার চাপা সুর ভেসে আসে। কার সব হারিয়ে গেল।

হেমন্তবালা ঘুমোতে পারেনি।

বাসিনীর কথাগুলো বার বার তার মনে ঘুরে ফিরে আসে। আজ সেও হঠাৎ নটবরকে দেখেছে বহুদিন পর। ভুলে যাওয়া দিনগুলোর ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

যৌবনের দিন।

হেমন্তবালাও সেদিন একজনের ব্যাকুল আহ্বানকে তুচ্ছ করে এই পথের নেশায় মেতেছিল। কিন্তু আজ দীর্ঘ জীবনের পথ পরিক্রমা করে মনে হয় ভুলই করেছিল সে। নিজের জীবন আর একজনের জীবন কী বেদনায় বিবর্ণ করে তুলেছে।

বাসিনীর এই হাহাকার তার চেনা।

এ যন্ত্রণার শেষ নেই। হেমন্তর ঘুম আসে না। শীতের কুয়াশা জমেছে বাগানের গাছ-গাছালির মাথায়। এই জগৎ—রাত্রির এই রূপ কতোদিন দেখেছে সে, যৌবনের স্মৃতিও মিশে আছে এমনি রাতের কুয়াশায়।

একা নিঃসঙ্গ একটি নারী, অতীতের সেই উজ্জ্বল স্মৃতিগুলো আজ মনে পড়ে। মনে পড়ে একটা মানুষের কথা। নটবর তখন যুবক—হেমন্তবালা তখন লবঙ্গের দলের সেরা গাইয়ে।

নটবরকে দেখেছিল প্রথম বৈরাগী তলার মেলায়। ও তখন পুতুল নাচের দল নিয়ে ঘুরছে।

সাবিত্রী সত্যবান পালা।

মাস্টার নটবর আড়াল থেকে দর্শকদের দেখছে। কচি কলাপাতা রং-এর শাড়ি পরনে, কাঁচপোকার টিপ নিটোল দেহ দু'চোখে কি নেশা লাগানো চাহনি।

নটবরের চোখটা ওখানে এসে থেমে গেছে। হাসছে মেয়েটি বৌ-এর ঝগড়া দেখে, হেসে গড়িয়ে পড়ে। কাঁপছে ওর দেহ কি নিবিড় ছন্দে।

সাবিত্রী সত্যবান পালা দেখে মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে গেছে। দু'চোখে শান্ত স্তব্ধ মুগ্ধ দৃষ্টি।

খেলা শেষ হয়ে গেছে। ওর সহচর রাশু নবনী দু'জনে পুতুল গোছাচ্ছে, বের হয়ে এসেছে নটবর—হঠাৎ সামনে ওই মেয়েটিকে দেখে দাঁড়ালো। পান খেয়ে পাতলা ঠোঁট দুটো টুক টুক করছে। সারা দেহে লাস্য ছুটিয়ে বলে মেয়েটি—তুমিই পুতুল খেলাচ্ছিলে না গ? বাহারের খেলা মাইরী। পুতুল লয় যেন জীবন্ত মানুষ।

নটবর হাসলো। মেয়েটিকে দেখছে সে।

—গান গাইতেও পারো দেখছি।

নটবর ভয়ে ভয়ে শুধোয়—তুমিও গাও নাকি?

হাসছে মেয়েটি—এ্যাঁ! গান গেয়েই যে রুজিরোজকার গো?

হেমন্ত ঝুমুরওয়ালির নাম শোননি? আমিই সেই মুখপুড়ি।

নটবর বলে—মুখপুড়ি কে বলে? মুখ তো সোন্দর, অমন রূপ। নেশা লাগানো চোখ ক'জনের আছে।

হেসে ওঠে তরুণী হেমন্তবালা—এ্যাঁ, লিশা লেগে গেল নাকি গ মাস্টার? এ রূপ লয়—পলাশ ফুলের মতই। চমক আছে—মধু নাই গ! আছে শুধু বিষ। এ ফুলের গন্ধ নাই—চারিদিকে শুধু কাঁটা, সেই কাঁটার জ্বালায় জ্বলে মলাম গো। তাই মনে হয় তোমার পুতুলের বৌ তবু ভালো আছে।

নটবর দেখছে মেয়েটিকে।

আজও মনে পড়ে সেই রাতের প্রথম দেখার মুহূর্তটি। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসছে নটবরের, রাত কত জানে না। চারিদিকে এখন স্তব্ধতা নেমেছে। চটের তাঁবু—ঘেরার ফাঁক দিয়ে শীতের

হাওয়া এসে গায়ে বেঁধে। কনকনে ঠাণ্ডা। কাঁপছে নটবর। স্বরটা চেপে এসেছে।

—জল। একটু জল।

চমকে ওঠে সৃষ্টিধর।

উঠে বসে নটবরের গায়ে হাত দিয়ে বলে—গা যে পুড়ে যাচ্ছে কত্তা! এত জ্বর।

জলটাও বিস্বাদ লাগে! তেষ্টা মেটে না। নটবর ঘোলাটে চোখ মেলে চাইল। বিড়বিড় করছে সে।

—কে? হেমন্ত? তুমি কেনে শুধু শুধু লোভ দেখাও হেমন্ত? দরকার নাই এই মেলায় মেলায় ঘুরে, ঘর বাঁধবো দু'জনে। হাসছো?

হেমন্তের এ হাসি নয়। ব্যর্থতার কি নিদারুণ জ্বালা ছড়িয়ে পড়ে ওই হাসিতে।—ঘর! হেমন্তের কান্নাটা হাসি হয়ে ফুটে ওঠে কি, বিদ্রূপের জ্বালা নিয়ে।

সেদিন কাঁদরের ধারে এমনি রাতের আঁধারে মেয়েটি গেয়েছিল—ঘর বাঁধা সই আমার হল না...

বিড়বিড় করছে নটবর।

চোখের সামনে হারিয়ে যাবে হেমন্ত। কোন আশ্বাস নেই।

—কত্তা। কত্তা। কে ডাকছে। চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে নটবর।

ডাক্তার আনবো কত্তা। সৃষ্টিধর শুধোয়।

ভোর হবার সময় সৃষ্টিধর নিজে বের হয়ে গেছে সরকারী ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তারবাবুও দেখে চিনতে পারেন সৃষ্টিধরকে। তিনিও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সস্ত্রীক দেখেছেন ওর পুতুল নাচ।

তাই শুধোন—কি ব্যাপার। সকালে এখানে?

সৃষ্টিধর বলে—দলের বড় কত্তার খুব অসুখ ডাক্তারবাবু, একবার চলুন। যেতেই হবে আপনাকে।

ডাক্তারবাবু বলেন—কাল প্রাইজ নিল।

—তখন ও জ্বর গায়েই গেছলো বাবু। বয়স হয়েছে—মেলায় মেলায় ঘুরে অনিয়ম তো হয়ই। একবার চলুন আপনি।

শীতের কুয়াশা নেমেছে গ্রামে, আখবন-কলাই-এর সবুজ ক্ষেতে। নটবর চলেছে অনেক দূরে—সঙ্গে হেমন্ত। দু'জনের সুর ওঠে বাতাসে। হেমন্ত সেজেছে আজ। কপালে সিঁদুর—মুখে সুন্দর মিষ্টি হাসি। পরনে লাল ডুরে শাড়ি। ঘরের সন্ধানে চলেছে তারা দু'জনে।

মেলার কোলাহল, ঝুমরীতলার উদ্দাম কোলাহল সব পেছনে ফেলে চলেছে তারা দু'জনে। নটবর-হেমন্ত।

—কত্তা! কত্তা!

কে যেন ডাকছে। না। চাইবে না নটবর। পড়ে থাক পুতুলের সংসার, জরির রাজপুত্র, টিনের তলোয়ার, ওই আলোর চমক, সে চলে যায় দূরে। ফিসফিসিয়ে বলে—চলে আয় হেমন্ত, আয়,—

কোন সুদূর নীলিমার মাঝে তারা যেন হারিয়ে যায়, নটবর এ জীবনে যেটাকে সহ্য করতে পারেনি, সেই পরম স্বপ্নকে পাথেয় করে সে অচেনা কোন জগতে হারিয়ে গেছে!

ডাক্তারবাবু বের হয়ে আসেন তাঁবু থেকে।

বৃদ্ধ নটবর আজ পুতুলের সংসারের মায়া কাটিয়ে কোথায় ভিন দেশে ফেরার হয়েছে।

সৃষ্টিধর একদিন ওই লোকটার কাছে ছিল। ওই ছিল তার সব। আজ বৃদ্ধ নটবর, তাকে ফেলে রেখে হারিয়ে গেল। কি অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে সৃষ্টিধর।

—ওস্তাদ, আমাকে ফেলে চলে গেলে ওস্তাদ।

হেমন্তবালা সকালে উঠে ভাবছিল নটবরকে দেখে আসবে। মনটা কেমন যেন ব্যাকুল হয়। আজও তাকে ভোলেনি হেমন্ত।

বাসিনী বলে—কোথায় চল্লে মাসী সেজেগুজে?

হেমন্ত বলে ওঠে—মরণ! ছুঁড়ির নজর সবদিকে? যাবি তো চল না!

বাসিনী বলে—চলো। দেখে আসি তোমার নাগরকে! তবে মাসী সেদিন ঘর বাঁধোনি—তবে আজ এত ঘটা কেনে গো? হাসে হেমন্ত!

হঠাৎ তাঁবুতে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় হেমন্তবালা।—ওস্তাদ!

সৃষ্টিধর চাইল ওর দিকে। ছেঁড়া চটের উপর পড়ে আছে নটবরের প্রাণহীন দেহটা। জীবনের এত পথ ঘুরে আজ পথের উপরই নিঃস্ব শূন্য হয়ে ফিরে গেল নটবর এই পুতুলের সংসার থেকে। হেমন্তের দু'চোখ জলে ভরে আসে। তার জীবনেও হয়তো নেমে আসবে এমনি নিষ্ঠুর মৃত্যু, সব জ্বালার শেষ হবে।

পথের মানুষ। অজানা পথের ধারেই তার শেষ। অবশেষে জ্বালিয়ে দিয়ে আবার পথেই হারিয়ে যাবে তারা।

বৈকাল নামছে। কাঁদরের ধারে নটবরের চিতাটা জ্বলে ওঠে। শেষকৃত্য করে সৃষ্টিধরই।

হেমন্ত বলে—তুমি ওস্তাদের ছেলের চেয়েও বড় সৃষ্টিধর। তোমার হাতেই আগুন পাক ও। ওর আত্মা শান্তি পাবে। ওস্তাদের তবু তুমি আছো গো—আর আমার? পোড়া মুখে আগুনও জুটবে না।

হেমন্তের কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে ওঠে।

চিতার আগুন জ্বলছে।

একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বাসিনী। এই জীবনের দুঃসহ শূন্যতার বেদনাকে সে দেখেছে। সারা জীবন নরকে বাস করে তাকেও একদিন এইভাবে শেষ হয়ে যেতে হবে।

এই জীবনে বাসিনীর আতঙ্ক এসে গেছে। নিষ্ঠুর শূন্যে এই জীবন মরুভূমির রুক্ষতা আর শূন্যতা নিয়ে তাকে যেন গ্রাস করতে আসছে।

বাসিনী বলে—চলো মাসী!

সন্ধ্যা নামছে ওরা ফিরছে বাসায়।

সব শূন্যতার মাঝেও এই মেলার রঙ্গিলা জীবন কমে না। আলো জ্বলে—লোকজন আসে আনন্দের সন্ধানে। যাত্রার আসরে সুর উঠছে।

সার্কাসের তাঁবুতেও আলো জ্বলে। ব্যাণ্ড এর সুর ওঠে। জীবনের এই খেলা কোথাও থামে না। একজন যায়—অন্যজন এগিয়ে আসে।

তাই মেলার জীবনে এ্যান্টনি—নটবরের মৃত্যু কোন রেখাপাতই করেনি।

বাসিনী বলে—ভ্যালা জগৎ মাসি! আলো এর নেভে না। বুকভরা দুঃখ তবুও রোশনি জ্বেলে হুল্লোড় করতে হবে।

হেমন্ত জবাব দিল না।

বাসিনী বলে—আজ নাচগান করতে বলো না মাসী! আজ দল বসতি করে দাও। গান গাইতে মন চায় না গো।

হেমন্ত বলে—তাই কর।

সেও আজ ক্লান্ত, বিষণ্ণ। হয়তো ভয়ই পেয়েছে নটবরের ওই মৃত্যুতে।

নটবরের পুতুল নাচের তাঁবুতেই আজ খেলা বন্ধ। সৃষ্টিধর গুম হয়ে বসে আছে। আধো আলো-আঁধারির মাঝে মনে হয় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ওই পুতুলের রাজ্যে।

আর আলো জ্বলেনি হেমন্তবালার ঝুমরির আসরে। হেমন্ত বলে—এসবে আর দরকার নেই রে। দল তুলে দোব।

জনার্দন ফিচেল লোক। সে তক্কে তক্কে ছিল, হেমন্তের কথায় বলে।

তা বয়স তো হয়েছে আর দেহেমনে এ ধকল সইবে কেনে? তবে হেমন্ত—দল তোমার নামেই চলবে, বল তো দল লীজ নিচ্ছি আমি।

মানে দল চালাবো, নামটাও বজায় থাকবে আর মাসে মাসে কিছু দোব, থোক টাকা।

কুসুম লতিকাও ঘাবড়ে গেছল মাসীর দল তুলে দেবার কথা শুনে। এবার তারা নিশ্চিন্ত হয় জনার্দনের কথায়। তবু তাদের বাঁচার পথ একটা থাকবে। বাসিনী কথা বলে না। তারও এই জীবনে আজ ক্লান্তি—হতাশা এসেছে। জনার্দন তার দলগড়ার স্বপ্ন দেখছে।

মাসীও খুশী হয়—তাই কর জনার্দন। ওদের রাখ দলে। বাসিনীও থাকবি তো ?

বাসিনী চুপ করে আছে।

হেমন্তবালাকে—ওই নটবর—সৃষ্টিধরকে দেখেছে সে। ওই ঈশ্বরকেও। সবাই যেন কক্ষচ্যুত গ্রহ, শুধু ভুল পথে কি জ্বালা নিয়ে ফিরছে। একদিন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বাসিনী দেখেছে ওই রক্তপাত—সর্বনাশটাকে। তাই যেন এই পথ থেকে সে সরে যেতে চায়, কিন্তু তাদের জন্য এত বড় পৃথিবীতে ঠাঁই নেই।

জনার্দন বাসিনীর দাম জানে, তাই বলে সে—বাসিনী থাকবে বৈকি। না হলে দল চালাবে কে ?

বাসিনী যেন বাজারের বিকি-কিনির পসরা, আর শেষ তাদের ওইভাবে পথে-পথেই শেষ হয়ে যেতে হবে।

ঈশ্বর চুপ করে বাড়িতেই রয়েছে দিন ভোর। পিসীও খুশী হয়। বলে সে—যাসনে বাবা আর। ছেড়ে দে ওসব। যা আছে তাতে দিন ভালোই চলে যাবে। জমি-জিরেত দেখ, চাষবাস কর। ঘর বাঁধ।

ঈশ্বর ভাবছে কথাটা।

ক'দিন থেকেই ভাবছে। বার বার মনে পড়ে বাসিনীর কথা। ভেবেছিল সে আসবে, কিন্তু আসেনি। পড়ন্ত বেলায় চাদর নিয়ে বের হতে দেখে পিসী ধমকে ওঠে।

—ফের চললি! তাহলে শেষ কথা শোন, রইল এসব। আমিও যেদিকে হু'চোখ যায় চলে যাবো।

ঈশ্বর বলে—খেলতে যাইনি পিসী। বলছি তো আজ খেলবো না, হয়তো আর কোনদিনই আর জুয়ার ছক পাতবো না। তারই চেষ্টা করছি পিসী।

পিসী ঠিক যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। শুধোয় সে—তাহলে চললি কোথায়?

—আসছি।

বের হয়ে গেল ঈশ্বর।

চুপ করে কি ভাবছে বাসিনী।

দেখেছে হেমন্তবালা দল ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে শেষ আশ্রয়ে।

নটবরও চলে গেল।

জনার্দন দল করছে। লোভী লোকটাকে চেনে বাসিনী। ওর দলে থাকবে না সে। তবু শেষ অবধি হেমন্তবালাকেই বলবে ওর ওখানে থাকবে সে। আজ এতবড় পৃথিবীতে তার আশ্রয়ও নেই।

বের হয়েছে বাসিনী।

এ মেলার পালা ফুরিয়ে আসছে। আজ ভাঙা হাট।

অনেক দোকান উঠে বৈরাগীতলার মেলায় চলে যাচ্ছে। আ যারা আছে তারাও এই রাতেই চলে যাবে।

কাল-পরশু সাফ হয়ে যাবে এই রংএর হাট। সার্কাসের আলো জ্বলেনি। ওরা তাঁবু তুলছে—চলে যাবে।

বাসিনী এসে দাঁড়ালো সেই আমগাছের নীচে। ভেবেছিল ঈশ্বরকে দেখবে আজও এখানে, তার মত জুয়াড়ী ওই নেশা ছাড়তে পারবে না।

কিন্তু জায়গাটা শূন্য। আলো জ্বলেনি। কেউ ছক পেতে দান হাঁকে না। এদিকে নেমেছে অন্ধকারের আভাষ।

—কে! চাইল বাসিনী।

এগিয়ে আসে ঈশ্বর। মাথায় ব্যাণ্ডেজ, চাদর জড়ানো।

বাসিনী বলে—ঠিক ভেবেছিলাম এখানেই আসবে। তা কই গো ওস্তাদ, ছক কই? কারবাইড লাইট—চ্যালারা ওসব কোথায়? বসে পড়ো—লাক টেরাই।

হাসে ঈশ্বর। বলে সে।

—আজ আর খেলছি না বাসিনী। কোনদিনই আর জুয়া খেলবো না।

—কেনে? অবাক হয় মেয়েটা।

ঈশ্বর বলে—সেদিন কি বলেছিলে? জুয়ার ছকে নিজেকে বাজি এড়ে দিলাম, পারো তো জিতে নাও, নাহলে তোমাকেই জিতে নোব। মনে নেই?

বাসিনী চাইল ওর দিকে।

ঈশ্বর বলে—হেরে গিয়ে তোমার হাতেই নিজেকে তুলে দিতে এসেছি বাসিনী। তুমি আমার শূন্য ঘরে যাবে বাসিনী?

অবাক হয় বাসিনী।

কি উত্তেজনায় কাঁপছে তার সারা দেহ মন। আজ একান্তে তার ব্যাকুল মন এমনি একটি নির্ভর, এমনি একটি আশ্রয় পেতে চায়।

বাসিনী তবু বলে। কি বলছো তুমি ওস্তাদ। আমি ঝুমুরওয়ালি—

হাসে ঈশ্বর।

—আর আমি! ডাকাত—জুয়াড়ী সবকিছু। গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা তো নই গো! তবে কেন—কেন আসবে না? আবার দু'জনে সব ভুল-পাপ ধুয়ে মুছে ঘর বাঁধবো, সুখী হবো!

বাসিনীর দেহটাকে টেনে নেয় ঈশ্বর ওর প্রশস্ত বুকের মাঝে। কি দুঃসহ কান্নায় ভেঙে পড়ে বাসিনী। এতবড় সৌভাগ্যকে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

কথাটা শুনে হেমন্তবালা খুশী হয়।

জীবনে সে যা পায়নি, হেলায় হারিয়েছিল আজ বাসিনী সেই পাওয়াকে ফিরিয়ে দেয় নি।

হেমন্ত বলে—বেশ করেছিস বাসি।

দেখছে সে ঈশ্বরকে। বলে হেমন্ত।

—বড় দুঃখী ও বাবা। ওকে সুখে রেখো।

জনার্দন গজগজ করে। তার সমূহ ক্ষতি হয়ে গেল। সে বলে বাসিনীকে ছেড়ে দিলে মাসী? এ্যাঁ—ঘরের বউ হতে চলে গেল! কি রাজ্যি পদ পাবে সেখানে? দলে থাকলে দুশো টাকা বেতন দিতাম খোরকী ছাড়া।

হেমন্তবালা বলে।

—থামবি জনার্দন। একজন ঘর পেল—কত সাধনার ঘর, যাবে না? এমনি গতর ফিরি করবে তোর জন্যে? বেশী বক্‌বক্ করবি তো তোকেই হটিয়ে দেব।

চুপ করে যায় জনার্দন।

ওরা মালপত্র গোছাচ্ছে।

মেলার খেলা শেষ। তবু ক'দিনেই এই রং-রঙ্গিলার আসরে অনেক খেলাই হয়ে গেল। কেউ হারিয়ে গেল—কেউ ব্যর্থ শূন্য জীবনে কিছু পেয়ে ধন্য হল।

সৃষ্টিধরও দলবল পুতুলের সংসার নিয়ে চলেছে আবার পথে। বৃদ্ধ নটবর এখানের মাটিতে হারিয়ে গেল।

ঈশ্বর বলে—আর যেতে হবে না পিসী, আমিও যাবো না। ওইসব ছেড়ে এবার ঘর-বসত চাষবাসই করবো পিসী। কই এসো?

ঢুকছে বাসিনী। পিসী অবাক হয়—ওমা! তুমি!

ঈশ্বর বলে—এও আর যাবে না পিসী। পেন্নাম করো।

পিসী অবাক হয় ওদের দু'জনকে প্রণাম করতে দেখে। ভজনও তাকে তাকে ছিল!

সে বলে ওঠে—দেরি হয়ে যাচ্ছে ওস্তাজ। ছক-বাটি-আলো নিইছি।

চটে ওঠে ঈশ্বর—শালার কেবল বাধা! নে-নে শালা—ছক-ঘুঁটি-বাটি-আলো সব নিয়ে বিদেয় হ' শালারা! আর ওসব কোনদিন এ বাড়িতে আনিস নে। তোরাই চালাগে—যা!

ভজন অবাক হয়—মানে! যাবা না?

হাসে ঈশ্বর—না। আর ওতে হাত দোব না। যা সব নিয়ে যা! হাঁ করে দেখছো কি পিসী। ঘরের লক্ষ্মী এনে দিলাম—আমার বৌ। পছন্দ হয়নি?

পিসী খুশীতে ভরে ওঠে—ওমা! দাঁড়া বাছা শাঁক বাজাই! জানান দিই সবাইকে। এসো মা—

শাঁখ বাজছে শীতের রাত্রে কি আনন্দ সংবাদ ঘোষণা করে। বাসিনীর দু'চোখ ভরে জল নামে কি আনন্দে। ঈশ্বরও যেন নোতুন পথ পেয়েছে।

গোপীবাগানের মেলা ভেঙে গেছে এবারের মত। প্রান্তরে-আমবাগানে নেমেছে স্তব্ধতা—নিঃসঙ্গতা। পড়ে আছে পোড়া ছাই, ছেঁড়া পাতার ভিড়। ওরই সঙ্গে ঝরা-পাতার মত উড়ে গেছে অনেকের জীবনের কতো স্মৃতি—কতো আনন্দের দিন—কতো মানুষ। তাদের হিসাব কেউ রাখে না।

বাসিনী আর ঈশ্বর সেই ধ্বংস স্তূপের মাঝে ঘর বেঁধেছে দু'জনে!
